জমির উর্বরতাবৃদ্ধির উপায়

নীলরতন ধর

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে বর্তমানে যে এ ধরনের পুস্তকের পাঠক আছে— ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হওয়ায়, তাহাই প্রতিভাত হইতেছে।

এই সময়ে এ দেশে কৃষিবিপ্লব হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়— কিন্তু এই পুস্তকের মূল তত্ত্ব— জমির স্থায়ী উর্বরতা বৃদ্ধি একই অবস্থায় আছে— তথাপি সময় পরিবর্তনের জন্য কোথাও কোথাও পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে— এবং স্থানে স্থানে সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে। এই কার্যে 'জমি ও ফসল'-এর লেখক স্নেহভাজন ডঃ মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করিয়াছেন।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

জমির উর্বরতাবৃদ্ধির উপায়

ক্ষুধাই মানবজাতির সর্বাপেক্ষা পুরাতন শত্রু। অতীত কালে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ একটি কঠিন সমস্যা ছিল। শস্য-উৎপাদনে বিভ্রাট ঘটিলে সকল দেশেই খাদ্যাভাব, অনাহার ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। অতীতে খাদ্যাভাবজনিত সংকটকে অপরিহার্য দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করা হইত। বর্তমানে খাদ্যসমস্যা আরো গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। মূলত পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই খাদ্যাভাব ও তজ্জনিত দুঃখ-কষ্টের প্রধান কারণ।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সারণী ১ দ্রষ্টব্য।

সারণী ১

খ্রীস্টপূর্বাব্দ	লোকসংখ্যা
৮০০০	অর্ধ কোটি
৫০০০	২ কোটি
১০০০	১০ কোটি
খ্রীস্টাব্দ	
১	২০ কোটি
১৬৫০	৫৪.৫ কোটি
১৭৫০	৭২.৮ কোটি
১৮৫০	১১৭.১ কোটি
১৯০০	১৬০ কোটি
১৯৫০	২৪০ কোটি
১৯৫৫	২৫৫.৫ কোটি

বর্তমানে লোকসংখ্যা ৩৫০ কোটি বলিয়া অনুমিত হয়।

লোকসংখ্যা অধিক বৃদ্ধির ফলে খাদ্যাভাব হেতু বর্তমানে বিজ্ঞান ও ফলিত

বিজ্ঞানের সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় জমির উর্বরতা বর্ধিত ও অধিকতর শস্য উৎপাদিত হইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌স্ -এর জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৯০ লক্ষ হইতে ৩'৪ কোটি হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকসংখ্যা উক্ত হারে বৃদ্ধি পাইলে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা হইত ৬০০ কোটি। কিন্তু ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা হইয়াছিল ১৬০ কোটি। ভারতবাসী ও প্রাচ্যের অন্যান্য জাতি অধিক সংখ্যায় সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকেন বলিয়া ইংরাজ ও ইউরোপের অন্য জাতিগণ কটাক্ষ করেন। ভারত-উপমহাদেশের জনসংখ্যা ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ছিল ৩৮'৫ কোটি এবং ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে উহা ৪৩'১ কোটি হয় অর্থাৎ বৎসরে বৃদ্ধির হার শতকরা ১'১৯। অথচ সুইডেনে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে মোট জনসংখ্যা ছিল ৫১'৩ লক্ষ এবং এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে ৭১'৫ লক্ষ হয়। উক্ত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০'৮। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সুইডেনের হার অপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু হল্যাণ্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৩০ হইতে ১৯৫০ প্রতি বৎসর শতকরা ১'৪ ছিল।

জাপানের জনসংখ্যা ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ছিল ৩৫০ লক্ষ। ইহা বর্ধিত হইয়া ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ৮৩০ লক্ষ হইয়াছিল। এই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অতি উচ্চ। সোভিয়েট রাশিয়াতে সম্প্রতি অধিক সংখ্যায় সন্তান উৎপাদনের সহায়তা করা হইতেছে। প্রতি প্রজন্মে জনসংখ্যা শতকরা ৩০ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। রাশিয়ার বর্তমান জনসংখ্যা ২২ কোটির কম নহে। ৫০ বৎসরে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে ৩০ কোটিতে পরিণত হয় বর্তমানে রুশ সরকার তাহার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি বৎসর চীন দেশে জনসংখ্যা ১৫০ লক্ষ, ভারতে ৬০ লক্ষ, রুশ দেশে ৩৬ লক্ষ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৬ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে।

পর পৃষ্ঠার সারণীতে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্-এ বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রদত্ত হইল।

সারণী ২

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাল (খ্রীস্টাব্দ)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১৮৭১ - ১৮৮০	১'৪
১৯০১ - ১৯১০	১'১৮
১৯৩১ - ১৯৪০	০'২৭

বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো কমিয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ফরাসি দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খুবই কম।

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা (১৯৮১) অনুমিত ৩৫০ কোটি। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ৪৫ কোটি লোক সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করে। সচ্ছল দেশসমূহের নাম— সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউ-জিল্যাণ্ড। দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীর অধিকাংশ জনসাধারণ কষ্টে জীবন যাপন করে। বলা বাহুল্য যে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান সংখ্যাগুরু দরিদ্র দেশ-সমূহের প্রায় সর্বনিম্নে ছিল। আজ অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেও ইহাতে সন্তুষ্ট হইবার কোনো কারণ নাই।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ ১২টি— ইন্দোনেশিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, আবিসিনিয়া, লাইবেরিয়া, ইকুয়েডর, হাইতি, সৌদি আরব, ইয়েমেন ও ফিলিপাইন্‌স্‌।

অন্যান্য দরিদ্র দেশ— আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বলিভিয়া, ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, গুয়াটামালা, হণ্ডুরাস, পারাগুয়ে, ইরান, ইরাক, নিকারগুয়া।

ভারতে খাদ্যাভাব ও জনসংখ্যার চাপ

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organisation

of the United Nations) কর্তৃক ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন দেশের যে খাদ্য-পরিস্থিতি ঘোষিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সারণী ৩

দেশের নাম	লোকসংখ্যা লক্ষ	দৈনন্দিন খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণ	দৈনন্দিন সমগ্র প্রোটিন (গ্রামে)	দৈনন্দিন জৈব প্রোটিন (গ্রামে)
অস্ট্রেলিয়া	৮৫'৪	৩২১০	৯৮	৬৭
সুইডেন	৭১'৬	৩২০০	৯৪	৬০
ডেনমার্ক	৪৩'২	৩১৬০	১০২	৫৯
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১৫৫৫	৩১৭০	৯১	৬০
নরওয়ে	৩৩'১	৩১০০	৯৬	৪৩
ফিনল্যাণ্ড	৪২	৩১৩৫	১০২	৫৬
যুক্তরাজ্য	৫০০	৩০৮০	৯১	৪৬
সোভিয়েট রাশিয়া	২০৫০	৩০২০	৯৭	২৫
ফ্রান্স	৪৩৪'৫	২৬৮৫	৯৭	৪১
পশ্চিম জার্মানী	৫০৫	২৬৬০	৭৯	৩৩
পূর্ব জার্মানী	২০০	২৪৬০	৭২	১৯
ইটালি	৪৬৮	২৩৭০	৭৫	২০
গ্রীস	৭৯'৪	২৪৯০	৭৭	৫
চীন	৪৫০০	২০২০	৬২	৬
ভারতবর্ষ	৩৬৬০	১৭০০	৪৩	৫
পাকিস্তান	৮০০	২০২০	৫২	১১
সিংহল	৭৯'৪	১৯৭০	৩৯	৬
ইন্দোচীন	২৭০	১৪৬০	৩৭	৫
ইন্দোনেশিয়া	৬০৭'৩	১৮৮০	৪২	৮

দেশের নাম	লোকসংখ্যা লক্ষ	দৈনন্দিন খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণ	দৈনন্দিন সমগ্র প্রোটিন (গ্রামে)	দৈনন্দিন জৈব প্রোটিন (গ্রামে)
জাপান	৮৪৯	২১০০	৫৩	১০
ফিলিপাইন্‌স্‌	২১০'৪	১৯৭০	৪৫	৯
মিশর	২০৮'১	২৩৬০	৭০	১৩
ইরাক	১৩০	২২৯০	৬৯	১১
পেরু	৮৫১	২২৭৬	৬৪	১৪
মেক্সিকো	২৪৪	২০৫২	৫৫	১৬

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাইবে যে, এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই খাদ্যের অভাব, বিশেষ করিয়া ক্যালোরি ও জৈব প্রোটিনের। খাদ্য বিষয়ে আমাদের দেশের স্থান অন্যান্য দেশ হইতে বহু নিম্নে। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের পর আমাদের দেশের খাদ্যাভাব আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্তমানে কিছু উন্নতি হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিসংখ্যান (Statistical) বিভাগের মতে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষই ছিল অন্য-সকল দেশের তুলনায় সর্বাপেক্ষা ক্ষুধার্ত এবং আয়ারল্যাণ্ড ছিল খাদ্যসম্ভারে সর্বাপেক্ষা ভরপুর ও সুপুষ্ট।

আমাদের দেশে যে কেবলমাত্র খাদ্যেরই অভাব তাহা নহে শিক্ষার দিক দিয়াও আমাদের দেশ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহু পশ্চাতে। নিম্নলিখিত সারণী হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

সারণী ৪

বিভিন্ন দেশের অশিক্ষিত লোকের সংখ্যার হার (১৯৬০)

দেশের নাম	১০ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক অশিক্ষিত লোকের সংখ্যার শতকরা হার
ভারতবর্ষ	৯০
মিশর	৮৫'২

দেশের নাম	১০ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক অশিক্ষিত লোকের সংখ্যার শতকরা হার
তুরস্ক	৭৯˙১
কোরিয়া	৬৮˙৬
প্যালেস্টাইন	৬৭˙৬
ব্রাজিল	৫৬˙৭
মেক্সিকো	৫১˙৬
শ্রীলঙ্কা	৪২˙২
স্পেন	২৩˙২
ইটালী	২১˙৬
হাওয়াই	১৫˙১
হাঙ্গেরী	৬˙০
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৪˙৩
ফ্রান্স	৩˙৮
সুইডেন	০˙১

উল্লিখিত সারণী হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে জনশিক্ষা বিস্তারে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা পশ্চাতে। জনবহুল দেশসমূহ জনশিক্ষা বিস্তারে অনগ্রসর বা অসমর্থ।

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা ও জৈব প্রোটিন-সংযুক্ত খাদ্য বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে খাদ্যের মান উন্নত হইতেছে না। রাশিয়ার খাদ্যমান বহু ইউরোপীয় জাতির খাদ্যমান অপেক্ষা হীন। এই কারণে নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস না করিলে খাদ্যমান উন্নত হইবে না, ফলে স্থায়ী জাতীয় উন্নতি অসম্ভব হইবে। ভারতবর্ষের বর্তমান খাদ্যাভাব ও শিক্ষায় অনগ্রসরতার মূল কারণ দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের প্রধান কারণ জনসংখ্যার বিপুলতা।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে বর্তমানে আইরিশ প্রজাতন্ত্র পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু অতীত কালে সেই দেশে আলু

উৎপাদনে প্রায়ই বিভ্রাট ঘটিত এবং দুর্ভিক্ষ ও অনাহার দেখা দিত। তাহার প্রধান কারণ এই যে আয়ারল্যাণ্ডের সেই সময়কার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমান সময়ের হার অপেক্ষা উচ্চ ছিল।

সারণী ৫

আয়ারল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা

১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে	২,৮৪৫,৯৩২
১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে	৫,৫৩৬,৫৯৪
১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে	৮,২৯৫,০৬১

১৭৮৫ হইতে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল শতকরা ৫। উক্ত হার হ্রাস পাইয়া ১৮০৩ হইতে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শতকরা ১·১ হয়। বর্তমানে আয়ারল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো হ্রাস পাইয়াছে।

১৯০১ হইতে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সমান ছিল। কিন্তু ইংরাজ জাতি ইহাতে বিপদ হইতে পারে বলিয়া বদ্ধপরিকর হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের প্রারম্ভে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯০১ হইতে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে হার ছিল তার এক-চতুর্থাংশ হইয়াছিল।

শিক্ষাবিস্তার ও জাতীয় আত্মসম্মান বৃদ্ধি হইলে প্রাচ্য জাতিপুঞ্জের পক্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করিয়া জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। বদ্ধপরিকর হইয়া লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি হ্রাস না করিতে পারিলে আমাদের দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব ও অশিক্ষার অবসান হইবে না।

রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সাম্যবাদী দেশসমূহ জনসংখ্যা হ্রাস করিতে মনোযোগী নহে। বর্তমানে চীন এই দিকে মনোযোগ দিয়াছে। তাহাদের ধারণা এই যে দেশের কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায় খনিজ দ্রব্য উৎপাদন বহুলভাবে বৃদ্ধি করিতে পারিলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস না করিয়াও সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়

যে শস্যাদি বৃদ্ধির হার সকল দেশে সকল সময়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা নিম্নে ছিল। এই কারণেই বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই দৈন্য, খাদ্যাভাব ও শিক্ষাভাব দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ লোকই অসচ্ছল। সচ্ছল লোকের সংখ্যা দারিদ্র্য-পীড়িত লোকের সংখ্যার এক-অষ্টমাংশ।

সর্বসুদ্ধ ৬৫ কোটি টন গম ধান্য যব ভুট্টা জোয়ার বাজরা রাগি ইত্যাদি প্রতি বৎসর পৃথিবীতে উৎপন্ন হইতেছে। এই পরিমাণ ফসল যদি পৃথিবীর জাতি-পুঞ্জকে লোকসংখ্যা অনুযায়ী সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব লোপ পাইবে এবং প্রত্যেক অধিবাসী প্রায় ৩২০০ ক্যালোরির খাদ্য দৈনিক আহার করিতে পারিবে। বর্তমানে পৃথিবীতে ডিম মাছ মাংস দুগ্ধ ননী (cream) মাখন পনীর আলু সবজি ফল ইত্যাদি উৎকৃষ্ট খাদ্য উৎপাদিত হয় ৪৫ কোটি টন। এই-সকল খাদ্যসামগ্রী পৃথিবীর জনগণের মধ্যে সাম্যনীতি অনুসারে ভাগ করিয়া দিলে কাহারো জৈব প্রোটিনের বা ভাইটামিনের অভাব হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় পৃথিবীতে সাম্যনীতির বহুল প্রচার এখনো হয় নাই। যে-সকল জাতি খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহারাও অভাবগ্রস্ত জাতিকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে সমর্থ হয় না।

ব্রিটেনে খাদ্যসমস্যা

সার টমাস মিডলটনের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে গ্রেট ব্রিটেনে যে খাদ্যসম্ভার উৎপন্ন হইত তাহাতে সেই দেশের অধিবাসীগণের প্রতি সপ্তাহে কেবলমাত্র শুক্রবার বিকাল হইতে সোমবার সকাল পর্যন্ত আহার চলিত। অপর দিকে জার্মানীতে ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্যের দশ ভাগের নয় ভাগই জার্মানীতে উৎপন্ন হইত এবং গ্রেট ব্রিটেনে ব্যবহৃত খাদ্যের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ সেই দেশে জন্মিত। জার্মানীতে গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষা অধিক ফসল উৎপন্ন হওয়ার কারণ এই নহে যে সেই দেশে প্রতি একর জমিতে গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষা অধিকতর ফসল

জন্মে। প্রকৃত কারণ এই যে গ্রেট ব্রিটেনে অধিকাংশ জমি তৃণাচ্ছাদিত, আর জার্মানীর বেশির ভাগ জমি ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত। অনেক চেষ্টায় বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনে প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভারের শতকরা ৩৫ ভাগ সেই দেশে উৎপন্ন হইতেছে। ব্রিটেন অর্থশালী, সেইজন্য অন্য দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ ; কিন্তু ভারতবর্ষ দরিদ্র, অন্য দেশ হইতে শস্য ক্রয় করা সহজ নহে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সুইডেনে খাদ্যাভাব হইয়াছিল, পরে উক্ত দেশে শস্য ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করা হয়। ফলে সেই দেশে বর্তমানে খাদ্যাভাব দূরীভূত হইয়াছে। এবং প্রয়োজন অপেক্ষা শতকরা দশ হইতে পনেরো ভাগ অধিক খাদ্য উৎপাদিত হইতেছে। অথচ ভারত-উপমহাদেশে ১৯১১ হইতে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি গড়ে প্রতি বৎসরে ৬০০ লক্ষ টন ধান্য গম বাজরা মকাই জোয়ার রাগি প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছে অর্থাৎ পৃথিবীতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের এক-দশমাংশ এই উপমহাদেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই উপমহাদেশের জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। সুতরাং এই উপমহাদেশের জনসাধারণের অধিকাংশ অর্ধাহারে জীবনযাপন করিতেছে এরূপ বলিলে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই।

খাদ্যসমস্যা ও বিশ্বশান্তি

ইউরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে যেহেতু পৃথিবীর বহুলোক অর্ধাহারে জীবনধারণ করে সেই হেতু পৃথিবীতে শান্তি স্থায়ী হইতে পারে না। এই সম্পর্কে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লর্ড বয়েড ওর যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। লর্ড বয়েড ওর ভারতবর্ষেও কয়েকবার আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বর্তমানে ইউরোপের অধিবাসিগণ দেখিতেছেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জাতিপুঞ্জ অভাব ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। ইউরোপীয় জাতিগণ সৈন্যের সাহায্যে এই অভিযান রোধ করিতে পারেন অথবা

এই-সকল দেশে কলকারখানা স্থাপন ও ব্যাবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়া জাতিগণকে সাহায্য করিতে পারেন। যদি এই-সকল জাতিকে সাহায্যের পরিবর্তে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন তাহা হইলে অবশেষে ইউরোপীয় জাতিগণই পরাভূত ও ধ্বংস হইবেন। সুতরাং অনুন্নত জাতিগণের উন্নতির চেষ্টা করা তাহাদের অবশ্যকর্তব্য। ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রয়োগকুশলতা বৃদ্ধি করিয়া দেশের উন্নতিসাধনই ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র। ইউরোপীয় জাতিগণের বিজ্ঞান ও কর্মকুশলতা অনুন্নত জাতিগণের উন্নতি ও সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত। এই উপদেশ কার্যে পরিণত করিলে ইউরোপীয় জাতিগণ অনুন্নত জাতিগণের প্রকৃত সাহায্য করিতে পারিবেন। কারণ, এইরূপে অধিক পরিমাণে শস্য ও খাদ্যসম্ভার উৎপাদিত ও নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহাই একমাত্র পথ যাহা অনুসরণ করিলে বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের ব্যবহারে পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য ও শিক্ষাভাব দূরীভূত ও মানবজাতির ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় হইতে পারে।'

কিছুদিন হইল ভারতীয় কৃষির উন্নতিকল্পে সুইডেনের বিশেষজ্ঞগণ দক্ষিণ-ভারতে একটি বৈজ্ঞানিক কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। নরওয়ে দেশবাসিগণও এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল। ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে নরওয়ের জনসাধারণ তাঁহাদের একদিনের আয় সংগৃহীত করিয়াছেন। সংগৃহীত অর্থ-দ্বারা কোচিনে কয়েকটি মৎস্যশিকারী জাহাজ প্রেরিত হইয়াছে। এই জাহাজগুলি সমুদ্রজলে মৎস্য শিকার করিয়া ভারতবর্ষের জৈব প্রোটিনের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কৃষিশিক্ষা গ্রামোন্নয়ন-পরিকল্পনা ইত্যাদিতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অন্য দেশ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া কোনো দেশ বা জাতিই বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। উপনিষদের একটি প্রধান উপদেশ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' স্মরণ করিয়া আমাদের সমবেত চেষ্টা ও শক্তি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিতে হইবে।

কৃষির উন্নতি এবং শস্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে জমির উর্বরতা

বৃদ্ধি করা অবশ্যকর্তব্য। এই বিষয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই বদ্ধপরিকর। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিজনিত খাদ্যাভাব দূরীকরণ, প্রতি একর জমিতে অধিকতর পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন এবং নূতন জমিতে কৃষি সম্প্রসারণ।

মৃত্তিকার বিশ্লেষণ

মৃত্তিকা কি? মৃত্তিকার উন্নতিকল্পে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। মৃত্তিকাতে উদ্ভিদ জন্মে ও বর্ধিত হয়। মৃত্তিকা হইতেই শস্যাদি খাদ্য সংগ্রহ করে। সাধারণত মৃত্তিকাতে অজৈব পদার্থ এবং জৈব পদার্থ দুইই থাকে। জল ও কার্বনিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় প্রস্তর মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। জল বায়ু ও সূর্যালোকের সাহায্যে মৃত্তিকাতে বীজ হইতে উদ্ভিদ জন্মে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে মৃত্তিকাতে নানা জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এলাহাবাদস্থিত শীলাধর ইনস্টিটিউটের সম্মুখস্থ জমির মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত যৌগিক পদার্থ ও জীবাণু পাওয়া গিয়াছে।

সারণী ৬

	শতকরা। ভাগ
লৌহভস্ম (Fe_2O_3)	৩.৪
চুন (CaO)	৪.১
ম্যাগনেসিয়াম ভস্ম (MgO)	১.৭১
পটাশ (K_2O)	১.০৬
মোট ফস্‌ফরিক অক্‌সাইড (P_2O_5)	০.৪১৩
শস্যলভ্য ফস্‌ফরিক অক্‌সাইড	০.১২৮
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (HCl) অদ্রবণীয় অংশ	৭৩.১
দগ্ধ করিলে (Loss on Ignition) ক্ষয়	৭.২৫
জৈব কার্বন (Organic Carbon)	১.৭৪৫৩
মোট নাইট্রোজেন (Total Nitrogen)	০.২৩৭৩

	শতকরা। ভাগ
অ্যাজেটোব্যাক্টের (নাইট্রোজেন আত্মীকরণকারী) জীবাণুর সংখ্যা (Azotobacter number)	প্রতি গ্রামে ৩৬ লক্ষ
সমগ্র জীবাণু-সংখ্যা	” ২২০ লক্ষ

আরো একখণ্ড সাধারণ জমির মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া নিম্নোক্ত পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল।

সারণী ৭

	শতকরা। ভাগ
লৌহভস্ম	৪.১২
চুন	১.০০২
ম্যাগনেসিয়াম ভস্ম	১.৫৯
পটাশ	০.৯৮৯
মোট ফস্ফরিক অক্সাইড	০.০৮৪১
শস্যলভ্য ফস্ফরিক অক্সাইড	০.০৩০৪
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয় অংশ	৮১.৬
দগ্ধ করিলে ক্ষয়	৩.৮৭
জৈব কার্বন	০.৪১৪
মোট নাইট্রোজেন	০.০৪৩৫
অ্যাজেটোব্যাক্টের জীবাণুর সংখ্যা	প্রতি গ্রামে ২০ লক্ষ
সমগ্র জীবাণু-সংখ্যা	” ১২০ লক্ষ

কোনো বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া যে ভস্ম পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে সেই বৃক্ষে কি কি খনিজ পদার্থ বিদ্যমান ছিল তাহা নির্ণীত হয়। কিন্তু বৃক্ষে যে-সকল জৈব পদার্থ থাকে বৃক্ষ দগ্ধ করিলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। শিমবর্গীয় উদ্ভিদ (leguminous plant) Lucerne (লুসার্ন) বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নোক্ত মৌলসমূহ পাওয়া গিয়াছে।

সারণী ৮

	শতকরা। ভাগ		শতকরা। ভাগ
অক্সিজেন	৭৭·৯	পটাসিয়াম	১·৭
কার্বন	১১·৩	সালফার (গন্ধক)	০·১
হাইড্রোজেন	৮·৭	ম্যাগনেসিয়াম	০·০৮
নাইট্রোজেন	৮·৩	ক্লোরিন	০·০৭
ফস্‌ফরাস	০·৭২	সোডিয়াম	০·০৩
ক্যালসিয়াম	০·৫৮		

মানুষের দেহে নিম্নোক্ত পদার্থ থাকে—

সারণী ৯

	শতকরা। ভাগ		শতকরা। ভাগ
অক্সিজেন	৬২·৮	সোডিয়াম	০·২৬
কার্বন	১৯·৪	পটাসিয়াম	০·২২
হাইড্রোজেন	৯·৩	ক্লোরিন	০·১৮
নাইট্রোজেন	৫·১	ম্যাগনেসিয়াম	০·০৪
ক্যালসিয়াম	১·৪	লৌহ	০·০০৫
সালফার (গন্ধক)	০·৫৪	সিলিকন	০·০০৪
ফসফরাস	০·৬৩		

এই বিশ্লেষণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে মৃত্তিকা বৃক্ষ ও মানুষের দেহে প্রায় একই প্রকার মৌলিক পদার্থ রহিয়াছে। মৃত্তিকাতে কি কি সার প্রয়োগ করা উচিত তাহা মৃত্তিকার উপাদান হইতে মোটামুটি স্থির করা যায়। মৃত্তিকাতে যে-সকল জৈব পদার্থ থাকে তাহা হইতে যে ভূমিপ্রাণ (Humus) প্রস্তুত হয় তাহার উপরই মৃত্তিকার ধর্ম অনেকটা নির্ভর করে। কারণ ভূমিপ্রাণ মাটিতে ধীরে ধীরে অক্সিজেন দ্বারা জারিত হইয়া থাকে। ফলে অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট, ফস্‌ফেট ও

বিভিন্ন ক্ষারকীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই-সকল পদার্থই উদ্ভিদের খাদ্য। সুতরাং যে জমিতে অধিক পরিমাণে ভূমিপ্রাণ থাকে সেই জমি হইতে উদ্ভিদের খাদ্য অধিক পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভূমিপ্রাণ-বহুল জমি সারবান। গাছ-গাছড়া, পাতা, জীবাণু ও অন্যান্য জৈব পদার্থ হইতে ভূমিপ্রাণের সৃষ্টি হয়। জমিতে বৃষ্টিপাত হইলে বা অন্য কোনো প্রকারে জল আসিলে উহাতে উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। পরে এই উদ্ভিদ বা ইহাদের অংশ জমিতে মিশ্রিত হইয়া ধীরে ধীরে অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত ও পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই জারণের তীব্রতা মাটির উত্তাপের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশে জমির তাপ বিভিন্ন প্রকার। কয়েকটি স্থানের জমির তাপের বার্ষিক গড় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সারণী ১০

১.	এলাহাবাদ প্রভৃতি উত্তর-ভারতের অনেক স্থান	২৬° হইতে ২৭° সে
২.	বঙ্গদেশ	২৪° হইতে ২৫° সে
৩.	ইংলণ্ডের রথামস্টেড (Rothamsted) নামক স্থানের বিখ্যাত কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র	৮° সে
৪.	ফ্রান্সের প্যারিস নগরীর নিকটবর্তী ভেরসাই কৃষিকেন্দ্র	১০° সে
৫.	সুইডেন দেশের উপ্‌সালা (Uppsala) শহরের প্রসিদ্ধ কৃষিশিক্ষালয় ও কৃষিকেন্দ্র	৫° সে

জমির শস্যখাদ্য

এলাহাবাদের জমিতে জৈব পদার্থ অতি সত্বরই জারিত হইয়া যায়। এই কারণেই এলাহাবাদের জমিতে ভূমিপ্রাণ খুব কম। এলাহাবাদ ও তন্নিকটবর্তী স্থান-সমূহের জমিতে সাধারণত ০.০৪ হইতে ০.০৫% নাইট্রোজেন থাকে। নাইট্রোজেনের পরিমাণ হইতে সাধারণত ভূমিপ্রাণের পরিমাণ নির্ণীত হয়। রথামস্টেডের জমিতে মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ ০.১২২%। আমাদের দেশের জমিতে

ভূমিপ্রাণ অথবা জৈব নাইট্রোজেন কম হইলেও অজৈব নাইট্রোজেন-যৌগ অথবা শস্যলভ্য (available) নাইট্রোজেন অধিক। আমাদের জমিতে যে জৈব নাইট্রোজেন থাকে তাহার শতকরা দশ হইতে ত্রিশ ভাগ শস্যলভ্য এবং উহা শস্য ও বৃক্ষাদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। শস্য বা বৃক্ষাদি জৈব নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না। জৈব নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাহায্যে মাটিতে ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া ও পরে নাইট্রেটে পরিণত হয়। নাইট্রেটই অধিকাংশ বৃক্ষের আসল খাদ্য। এই নাইট্রেট গ্রহণ করিয়া বৃক্ষাদি আমিষ জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ প্রোটিন উৎপাদন করে। এই সহজলভ্য নাইট্রোজেনের অভাবে জমির উর্বরতা লোপ পায়। শীতপ্রধান দেশে মাটিতে তাপ কম বলিয়া অক্সিজেনের সাহায্যে জৈব পদার্থ খুব ধীরে ধীরে জারিত হয় এবং জৈব নাইট্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট উৎপন্ন কম হয়।

নিম্নলিখিত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের মাটিতে শস্যলভ্য নাইট্রোজেন শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা অধিক। এক একর জমি ১৫-১৬ সেমি খনন করিলে যে মাটি পাওয়া যায় তাহার ওজন হইবে ১০০০ হইতে ১৩০০ টন এবং এই মাটিতে প্রায় ৫০০ হইতে ৬০০ কেজি নাইট্রোজেন থাকে। শীতপ্রধান দেশে এক একরে ১২০০ হইতে ১৫০০ কেজি নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। অথচ আমাদের জমিতে এক একরে অন্তত ৫০ হইতে একশত কেজি সহজলভ্য নাইট্রোজেন রহিয়াছে। ফসল সহজে এই নাইট্রোজেন ব্যবহার করিতে পারে। অথচ শীত-প্রধান দেশের মাটিতে জৈব নাইট্রোজেন অথবা মোট নাইট্রোজেন অধিক হইলেও শস্যলভ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম। রথামস্টেডের মাটিতে জৈব নাইট্রোজেন (মোট নাইট্রোজেন) এক একরে ১২০০ হইতে ১৫০০ কেজি। কিন্তু উহার মধ্যে শতকরা মাত্র এক হইতে দুই ভাগ শস্যলভ্য। অর্থাৎ প্রতি একরে মাত্র ২৫ হইতে ৩০ কেজি শস্যলভ্য নাইট্রোজেন (অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট) পাওয়া যায়। অবশিষ্ট আপাতত উদ্ভিদের কোনো উপকারে লাগে না। আমাদের দেশের মাটিতে সহজ-লভ্য নাইট্রোজেন অধিক পরিমাণে রহিয়াছে বলিয়া জমিতে সার প্রয়োগ না

করিয়াও শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা সহজভাবে শস্য উৎপাদন করা সম্ভব। ভারতীয় কৃষকগণ জমিতে কোনো প্রকার সার প্রয়োগ করিতেন না বলিলেই চলে, অথচ সেই জমিতে প্রতি বৎসর ধান্য গম বা অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভারতে নবাগত বৈদেশিকগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া যান। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড লিনলিথগো আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে বিনা সারে কি প্রকারে আমাদের দেশে ফসল উৎপন্ন হয়। স্যার টমাস মিডলটন (Sir Thomas Middleton), কেম্ব্রিজের বিখ্যাত অধ্যাপক স্যার গাউল্যাণ্ড হপ্‌কিনস্‌ এবং বহু জার্মান বৈজ্ঞানিকও এই বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখিলে পরে ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ উঠাইয়া লওয়া যায়। প্রথমে অর্থ গচ্ছিত না রাখিলে ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ পাওয়া সম্ভব নহে। এইরূপে জমিতে শস্যের খাদ্য প্রয়োগ না করিয়া কি প্রকারে শস্য উৎপাদন করা সম্ভবপর ইহা সত্যই বিস্ময়কর। বিদেশীয়গণ ভারতবর্ষের কৃষিপদ্ধতি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকেন। এই পদ্ধতিতে অধিকাংশ কৃষকই কৃষিক্ষেত্রে কোনো সার প্রয়োগ করেন না, অথচ বৎসরের পর বৎসর এক একর জমিতে সাত-আট মণ গম অথবা দশ-বারো মণ ধান্য উৎপাদন করিয়া থাকেন।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাধারণত এক একর জমিতে যে ধান্য বা গম উৎপন্ন হয় তাহাতে ১০-১২ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৭-৮ কেজি ফস্‌ফরাস এবং ২০-২৫ কেজি পটাসিয়াম অক্‌সাইড (K_2O) থাকে। সুতরাং প্রতি বৎসর উপরি উক্ত পরিমাণ শস্যখাদ্য ফসল গ্রহণ করিয়া থাকে এবং জমিতে ঐ পরিমাণ শস্যখাদ্য কমিয়া যাইবার ফলে ধীরে ধীরে সেই ক্ষেত্র অনুর্বর হইতে থাকে। আমাদের দেশের সাধারণ শস্যক্ষেত্রে নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ, ফস্‌ফরাস-যুক্ত পদার্থ এবং পটাসিয়াম-যুক্ত পদার্থ—এই তিন প্রকারের শস্যখাদ্য কি পরিমাণ থাকে তাহা দেখা যাক।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে উত্তর-ভারতে এক একর জমিতে প্রায় ৫০০ হইতে ৬০০ কেজি নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ থাকে। যদি প্রতি বৎসর ১০-১২ কেজি

নাইট্রোজেন জমি হইতে নিষ্কাশিত হয় এবং জমিতে কোনোরূপ নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ প্রয়োগ করা না হয়, তাহা হইলে প্রায় ৫০ বৎসরে শস্যক্ষেত্র নাইট্রোজেন-শূন্য হইবে।

আমাদের দেশের অনেক কৃষিক্ষেত্রে সাধারণত শতকরা ০·০১ ভাগ ফস্ফেট (P_2O_5) থাকে। অর্থাৎ এক একর জমিতে ১৫-১৬ সেমি গভীরতায় ১০০০ হইতে ১২০০ কেজি ফস্ফেট পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার সমগ্রই শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে না। অনেক দেশে দেখা গিয়াছে যে শস্যক্ষেত্রে যে পরিমাণ ফস্ফরাস থাকে তাহার শতকরা ২০ ভাগের অধিক শস্যের পক্ষে লভ্য বা গ্রহণ-যোগ্য অবস্থায় পাওয়া যায় না। সুতরাং জমিতে প্রতি একরে আনুমানিক ২০০-২৫০ কেজি লভ্য ফস্ফেট থাকে। যে জমিতে ধান্য বা গমের চাষ হয় তাহা হইতে এই পরিমাণ ফস্ফেট আনুমানিক ৩০ বৎসরে শেষ হইয়া যাইতে পারে।

সাধারণ জমিতে নাইট্রোজেন অথবা ফস্ফেট অপেক্ষা পটাসিয়াম অক্সাইড (K_2O) অধিক পরিমাণে থাকে। ভারতবর্ষের সাধারণ জমিতে অনেক সময় শতকরা ০·২ ভাগ পটাসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রতি একরে ২০০০-২৫০০ কেজি পটাসিয়াম অক্সাইড থাকে। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, প্রতি বৎসর ধান্য বা গম উৎপাদন করিলে জমির সকল পটাসিয়াম নিঃশেষ হইতে একশত বৎসর সময় লাগিবে।

বৃষ্টির জলেও উদ্ভিদের খাদ্য আছে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে আমাদের দেশে এক একর জমিতে বৃষ্টির জল হইতে প্রায় তিন-চারি কেজি নাইট্রোজেনের যৌগ যুক্ত হয়। অপরপক্ষে কিন্তু বৃষ্টির জলে নাইট্রোজেনের যৌগ অর্থাৎ নাইট্রেট দ্রবীভূত হইয়া ক্ষেত্রের বহু নিম্নস্তরে চলিয়া যায়। ফলে ফসলের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে, এক একর জমিতে দুই-তিন কেজি নাইট্রোজেন উদ্ভিদের কোনো উপকারে আসে না।

আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাটিতে সাধারণত ক্যালসিয়াম ফস্ফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফস্ফেট থাকে। উহাতে অল্প পরিমাণে আয়রন ফস্ফেট, অ্যালু-

মিনিয়াম ফস্‌ফেট এবং টাইটেনিয়াম ফস্‌ফেটও থাকে। শীতপ্রধান দেশের জমিতে আয়রন ফস্‌ফেট, অ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফেট ও টাইটেনিয়াম ফস্‌ফেটের পরিমাণ অধিক। এ-সব ক্ষেত্রে জল পাইলেও ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ফস্‌ফেট খুব কমই দ্রবীভূত হয়।

মাটিতে যে জল থাকে তাহাতে অল্প পরিমাণে নাইট্রেট ও পটাসিয়াম লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং উদ্ভিদের মূল তাহাই শোষণ করে। ফস্‌ফেট এই জলে অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার কারণ জমিতে যে-সকল ফস্‌ফেট থাকে তাহা জলে সহজে দ্রব হয় না। শস্য উৎপাদনের জন্য ফস্‌ফেট ক্রমাগতই অল্প অল্প দ্রবীভূত হওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ীগণ খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিয়া ক্যালসিয়াম সুপারফস্‌ফেট প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি টন সুপার-ফস্‌ফেট উৎপন্ন হয় এবং উহা বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। ক্যালসিয়াম সুপারফস্‌ফেট জলে সহজে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু জমিতে এই দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম সুপারফস্‌ফেট জমির ক্যালসিয়ামের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুনরায় ক্যালসিয়াম ট্রাই ও ডাই ফস্‌ফেটে পরিণত হয়।

ক্যালসিয়াম ট্রাই ফস্‌ফেট অস্থি, দাঁত ও খনিতে থাকে। ইহা জলে অল্প মাত্রায় দ্রবণীয়। ক্যালসিয়াম ডাই ফস্‌ফেট ক্যালসিয়াম ট্রাই ফস্‌ফেট অপেক্ষা সামান্য অধিক পরিমাণে দ্রবণীয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সুপারফস্‌ফেটও জমিতে দ্রবীভূত অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকে না। এবং উদ্ভিদের মূল সহজে জমি হইতে ফস্‌ফেট শোষণ করিতে পারে না। যে-সকল স্থানে জমিতে লৌহ অ্যালু-মিনিয়াম ও টাইটেনিয়ামের অক্‌সাইড আছে, সে-সব স্থানে প্রয়োগ করা ফস্‌ফেট এই-সব ধাতুর ফস্‌ফেটে পরিণত হয়, ফলে উদ্ভিদের পোষণে লাগে না। ইউরোপের জমিতে অম্লজাতীয় পদার্থ থাকায় লৌহ অ্যালুমিনিয়াম ও টাইটেনিয়াম ধাতু অল্প পরিমাণে এই-সব অম্লের লবণ অবস্থায় থাকে। এই প্রকার জমিতে ক্যালসিয়াম সুপারফস্‌ফেট প্রয়োগ করিলে আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম ও টাইটেনিয়াম ফস্‌ফেটে

পরিণত হয়। এই ফস্‌ফেট জলে অতি অল্প পরিমাণে দ্রবণীয় এবং শস্যমূল উহা শোষণ করিতে পারে না। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বৃষ্টির জলে জমির ফস্‌ফেট অল্প পরিমাণে ধৌত হইয়া বহির্গত হইতে পারে এবং এক একর জমি হইতে বৎসরে এক কেজির অধিক ফস্‌ফেট সাধারণত এই প্রকারে নিষ্কাশিত হয় না। আমরা আরো লক্ষ করিয়াছি যে ফস্‌ফেট জমিতে প্রয়োগ করিলে জমি হইতে ক্যালসিয়াম ধৌত হইয়া অল্প পরিমাণে বহির্গত হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম জমির অনেক নিম্নস্তরে চলিয়া যায় অথবা জমি হইতে বহির্গত হইয়া যায়। এই প্রকারে বৎসরে দুইশত কেজি পর্যন্ত ক্যালসিয়াম জমি হইতে বহির্গত হয়। ক্যালসিয়াম জমি হইতে নিষ্কাশিত হইয়া গেলে জমি অম্ল হইয়া উঠে। অম্ল-জমিতে ফসল উৎপাদন করা অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধাজনক ও কঠিন হইয়া পড়ে। শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা এই অসুবিধা অধিক দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ এই যে শীতপ্রধান দেশে জমির তাপমাত্রা ৫° হইতে ১০° সে। উত্তর-ভারতের জমির তাপমাত্রা ২৫° হইতে ২৮° সে। উত্তর-ভারতের জমিতে বৃষ্টি বা শিলাপাত হইলে অথবা অন্য প্রকারে জল আসিলে উহার অধিকাংশই বাষ্প হইয়া উবিয়া যায় ও জমিতে অধিক সময় জল থাকিতে পারে না। অথচ ইউরোপ বা আমেরিকায় বৃষ্টি বা বরফের জল জমির সংস্পর্শে আসিলে উহার অল্পাংশই বাষ্পে পরিণত হয়। অধিকাংশ জল জমিতে প্রবেশ করিয়া চুন, নাইট্রেট ইত্যাদির লবণকে দ্রবীভূত করে। ফলে তাহা জমির বহু নিম্নস্তরে চলিয়া যায়। এই কারণে অম্ল-জমি শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়।

সুতরাং শস্য উৎপাদনের ফলে এবং জলের প্রভাবে জমির উর্বরতা হ্রাস হইয়া যায়। সেই হেতু প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতি জমির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট। মানবজাতি প্রথমে যাযাবর ছিল। তাহারা তখন গৃহপালিত পশুর সাহায্যে এবং বন্য জন্তু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। পরে কৃষিকার্য আরম্ভ হয় এবং তাহারা দেখিল যে শস্য উৎপাদনে গৃহপালিত পশুর বিষ্ঠা অতি

উপকারী। হলচালনা করিয়া গবাদি পশুর বিষ্ঠা শস্যক্ষেত্রে মিশ্রিত করিলে পরবর্তী ফসলের উন্নতি হয়। এইরূপে সকল প্রকার বিষ্ঠা সার হিসাবে ব্যবহার আরম্ভ হইল। এক সময়ে গৃহপালিত পশুপক্ষীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অধিক ছিল। তখন তাহাদের বিষ্ঠা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট ফসল উৎপন্ন হইত। ক্রমে গৃহপালিত পশুপক্ষীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং অন্য-জাতীয় সারের প্রয়োজন হইল।

এক একর জমিতে দশ টন গোবর-জাতীয় সার প্রতি বৎসর প্রয়োগ করিলে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় এবং জমির উর্বতার ক্ষয় হয় না। পশ্চিম-ইউরোপে সাধারণত দেখা গিয়াছে যে চারি-পাঁচ টন গোবর প্রতি বৎসর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে সেই ক্ষেত্রের উর্বরতা হ্রাস পায় না। ডেনমার্কে প্রায় এই হারেই কৃষি-ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর গোবর প্রয়োগ করা হয়। ডেনমার্কের কৃষি অতি উন্নত। প্যারিস মহানগরীতে অনেক সময় ডেনমার্কে প্রস্তুত মাখন সস্তা দরে পাওয়া যায়। ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে ডেনমার্কের কৃষি ও গোপালন -পদ্ধতি অতি উত্তম। জমিতে অধিক পরিমাণে খড়-মিশ্রিত গোবর প্রয়োগই ডেনমার্কের কৃষির উন্নতির ভিত্তি।

পশ্চিম-ইউরোপে কৃষিকার্যে জমি-কর্ষণে পশু অপেক্ষা ট্র্যাক্টর বা অন্য যন্ত্রাদিই অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। এই কারণে সেখানে অশ্ব বা গোরুর গোবরের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। ফলে সুইডেনে বর্তমানে এক একর জমিতে পাঁচ-ছয় টন গোবর প্রয়োগ করাও সম্ভব হইতেছে না, কেবলমাত্র দুই টন খড়-মিশ্রিত গোবর সেখানকার জমিতে বর্তমানে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছে। ফরাসি দেশে একর প্রতি মাত্র এক টন গোবর ব্যবহৃত হয়। কারণ কৃষিকার্যে যে পরিমাণ গোবর ব্যবহার করা উচিত সেই পরিমাণ গোবর পাওয়া যায় না। এইজন্য পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকায় কৃত্রিম সার অধিকতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

এক টন গোবরে প্রায় পাঁচ কেজি যৌগিক নাইট্রোজেন থাকে। সুতরাং দশ টন গোবর কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে তাহাতে প্রায় ৫০ কেজি যৌগিক

নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এমন-কি, বিশ বা পঁচিশ মণ গম এক একরে উৎপাদিত হইলেও কুড়ি কেজির অধিক নাইট্রোজেন সেই গম এবং তাহার খড়ে থাকে না। উদ্ভিদের খাদ্য ফস্‌ফেট, পটাশ, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি পদার্থও গোবরে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে।

গোবরের এবং মাতগুড়ের উপকারিতা

বহু বৎসর গবেষণা করিয়া আমরা নির্ধারণ করিয়াছি যে গোবরের অতি প্রয়োজনীয় দুই প্রকার গুণ আছে। গোবরে কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate), পেণ্টোসান (Pentosan), সেলুলোজ (Cellulose) ইত্যাদি জৈব পদার্থ থাকে। এই-সকল পদার্থ জমিতে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে জারিত হইতে থাকে এবং কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও জল উৎপন্ন করে ও সেই সঙ্গে শক্তির (Energy) সৃষ্টি হয়। আমরা যে খাদ্যাদি আহার করি তাহা শ্বাসকার্যে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে ধীরে ধীরে জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও শক্তিতে পরিণত হয়। এই শক্তির সাহায্যে আমরা কার্য করিয়া থাকি। সুতরাং চিনি গুড় চাউল আলু ও রুটিতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় শ্বেতসার (Starch) প্রভৃতি যে-সকল যৌগিক পদার্থ আছে তাহা শক্তিপ্রদায়ক। এই-সকল পদার্থে কার্বন থাকে এবং এই-সব কার্বনের অক্সিজেনের সাহায্যে ধীরে ধীরে জারণ হইবার ফলে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি কর্মশক্তির ভিত্তি। কয়লা দগ্ধ করিলে শক্তি পাওয়া যায়। এই শক্তির সাহায্যে রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলে। কয়লাতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন আছে। পেট্রোল এবং ডিজেল তেলেও অধিক পরিমাণে কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থ থাকে। এই-সকল পদার্থ বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি সৃষ্টি করে। এই শক্তির সাহায্যে মোটর গাড়ি চলিতে পারে। গোবর মাটিতে মিশ্রিত করিলে উহার কার্বন যৌগসমূহ ধীরে ধীরে অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হয় এবং কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি উৎপাদন করে।

স্যার জন রাসেল (Russell) বলিয়াছেন যে রথামস্টেডের কৃষিক্ষেত্রে এক একরে ১৪ টন গোবর প্রয়োগ করিলে সেই ক্ষেত্র হইতে ৪১ হাজার ক্যালোরি পরিমাণ তাপ প্রতি দিন নির্গত হয়। গোবর হইতে উৎপন্ন সমগ্র শক্তিই তাপে পরিণত হয় না। অল্প পরিমাণ শক্তি বায়ুর নাইট্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহাকে অ্যামোনিয়া প্রোটিন ইত্যাদিতে পরিবর্তিত করে। চিনি বা গুড় যখন দেহে জারিত হইতে থাকে তখন আমরা শক্তি পাই।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 = 6CO_2 + 6H_2O + 676k\ Cal$$
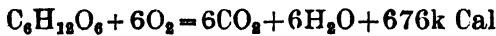
অধিকাংশ উদ্ভিদ বা বৃক্ষাদি খাদ্য হিসাবে বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না তাহা পারমাণবিক হাইড্রোজেনের সহিত সহজেই সংযুক্ত হইতে পারে। জলের তাপ বিশ্লেষণের ফলে এই পারমাণবিক হাইড্রোজেনের সৃষ্টি হয়। এই প্রকারে জমিতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে জমিতে অ্যামোনিয়া হইতে নাইট্রেট সহজে প্রস্তুত হয়। সকল ফসলই নাইট্রেটকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পায়। নাইট্রেটই উদ্ভিদের সর্বশ্রেষ্ঠ নাইট্রোজেন-যুক্ত খাদ্য। দেখা গিয়াছে যে শ্বেতসার-বহুল শস্যাদি যেমন, গম ধান্য ইত্যাদি, অ্যামোনিয়া-যুক্ত পদার্থও খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু নাইট্রেটই ইহাদের সর্বোত্তম নাইট্রোজেন-যুক্ত খাদ্য। ইংলণ্ডের রথামস্টেডে বহুকাল গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সার প্রয়োগ না করিলেও এক একর জমিতে সাত-আট মণ গম উৎপন্ন হয়। কিন্তু গোবর বা অ্যামোনিয়া-সংযুক্ত রাসায়নিক সার অথবা সোডিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ করিলে ফসল বৃদ্ধি পায় এবং এক একরে ২০ হইতে ২৫ মণ গম পাওয়া যায়। গোবর-সারে ফসল বৃদ্ধি পায় বলিয়াই পৃথিবীর সর্বত্র পূর্বে গোবর সার-রূপে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে ধনী দেশসমূহে গোবরের পরিবর্তে অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সিয়ানামাইড, অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট প্রভৃতি ও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ইউরিয়া শস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, জমিতে গোবর প্রয়োগ করিলে গোবরের

কার্বন-যুক্ত পদার্থগুলি ধীরে ধীরে জারিত হইয়া শক্তি সৃষ্টি করে। এই শক্তি ক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। বায়ুর যে নাইট্রোজেন গ্যাস উদ্ভিদের ব্যবহারে আসে না তাহাকে এই শক্তি জলের সাহায্যে অ্যামোনিয়াতে পরিবর্তিত করে। এই প্রক্রিয়া সূর্যালোকের প্রভাবে বৃদ্ধি পায়। অ্যামোনিয়া অক্সিজেনের সাহায্যে নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়তা করে।

আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, জমি চাষ করিয়া মাটিতে চিনিকলের অপজাত মাতগুড় মিশ্রিত করিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, অ্যামোনিয়া নাইট্রেট ও ভূমিপ্রাণের পরিমাণ বর্ধিত হয়। মাতগুড়ের চিনি অক্সিজেনের সাহায্যে জমিতে ধীরে ধীরে জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি সৃষ্টি করে। এই শক্তি জল এবং নাইট্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটাইয়া অ্যামোনিয়াতে পরিবর্তিত করিতে পারে। অ্যামোনিয়া জমিতে অক্সিজেনের সাহায্যে নাইট্রেটে পরিণত হয়। এইরূপে মাতগুড় উত্তম সার হিসাবে কার্য করিতে পারে। কিছুকাল পূর্বে মাতগুড় প্রচুর পরিমাণে চিনির কলকারখানার পার্শ্বে অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত।

আমাদের গবেষণামূলক আবিষ্কার অনুসারে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং ঊষর ও অনুর্বর ক্ষারকীয় জমির সংশোধনে প্রভূত মাতগুড় ব্যবহৃত হইয়াছে।

গোবর যুগযুগান্তর হইতে পৃথিবীর সর্বত্রই শস্য উৎপাদনে সাররূপে আদৃত হইয়াছে। এতকাল মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীগণ বলিয়া আসিয়াছেন যে, গোবরে শস্যখাদ্য নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ, ফস্‌ফেট, পটাশ এবং চুন আছে এবং গোবর জমির জল-ধারণ ক্ষমতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক গুণাবলী বর্ধন করিয়া থাকে এবং এই কারণে গোবর সার হিসাবে উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমাদের গবেষণায় গোবরের আরো দুই মহৎ গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জমিতে প্রয়োগ করিলে গুড়ের ন্যায় গোবরও বায়ুর নাইট্রোজেনকে আত্মীকরণ করিয়া অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট ও ভূমিপ্রাণ গঠন করে। ফলে জমির উর্বরতা আরো বর্ধিত হয়। সূর্যের আলোক এই প্রক্রিয়ার সহায়ক। গোবরের দ্বিতীয় গুণ এই যে, ইহা জমির নাইট্রোজেনের যৌগসমূহকে সংরক্ষণ করে। জমিতে যে-সকল

নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ থাকে তাহা ধীরে ধীরে বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হইতে থাকে। এই জারণ ক্রিয়ায় ইহা প্রথমে অ্যামোনিয়া তার পর নাইট্রাইট এবং পরিশেষে নাইট্রেটে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মধ্যপথে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি হইতে পারে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট অতি সহজে বিশ্লেষিত হইয়া নাইট্রোজেন গ্যাস ও জলে পরিণত হয়। ($NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O + 718k$ Cal)। নাইট্রোজেন গ্যাস উদ্ভিদের কোনো উপকার করে না। সুতরাং উক্ত প্রক্রিয়া উপকারী নাইট্রোজেনের যৌগসমূহকে নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত করে যাহা শস্যের কোনো কাজে আসে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে জমিতে একশত ভাগ অ্যামোনিয়া-যুক্ত পদার্থ প্রয়োগ করিলে তাহার অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মাত্র কৃষির কার্যে লাগে এবং অপর অর্ধেক ধ্বংস হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, অ্যামোনিয়া-যুক্ত পদার্থ আংশিক-ভাবে জমিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটে পরিণত হয়।

গোবরের মধ্যে যে-সকল কার্বন-যুক্ত পদার্থ থাকে তাহা জমির নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থগুলির জারিত হইবার সম্ভাবনা হ্রাস করিয়া দেয়। শারীরতত্ত্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চিনি রুটি ভাত প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট আহার করিলে দেহের মাংসপেশী ও অন্যান্য প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ ধ্বংস হইতে পারে না অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট-সমূহ প্রোটিনের জারণের হার হ্রাস করিয়া দেয় এবং প্রোটিনকে রক্ষা করে। ঠিক এই প্রকারে গোবরের কার্বোহাইড্রেট-সমূহও গোবর ও মাটির প্রোটিন ও অ্যামোনিয়াকে বাঁচাইয়া রাখে। ইহা গোবরের একটি অতি ভালো ও প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণ। গোবরের পরিবর্তে তৃণ খড় বিচালি পাতা এমন-কি, অপ্রয়োজনীয় কয়লাচূর্ণ ইত্যাদি আমরা নানাভাবে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে এই-সকল দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়। জমিতে গোবরের ন্যায় এই-সকল দ্রব্য বায়ুর নাইট্রোজেনকে ব্যবহার করিয়া অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট ও ভূমিপ্রাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং জমির প্রোটিনকে রক্ষা করে। তবে এই-সকল দ্রব্য গোবর

অপেক্ষা ধীরে ধীরে জারিত হয় ও পরিবর্তিত হয় বলিয়া সারে পরিণত হইতে সময় লাগে অধিক।

উত্তর-ভারতে এক একর কর্ষিত জমিতে ৫ টন তাজা গোবর প্রয়োগ করিলে একমাস দেড়মাস পরই তাহাতে ধান্য বা গম বপন করা যায়। মাতগুড়ও একমাস বা দেড়মাসের মধ্যে ক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু খড় পাতা তৃণ ইত্যাদি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে তিন মাস সময় লইয়া থাকে।

আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, বিশ টন গোবর এক একর জমিতে মিশ্রিত করিলে জমির যৌগিক নাইট্রোজেন শতকরা ০'০৩৭ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ০'০৯৪ হয়। দ্বিতীয় বৎসর ঐ জমিতে পুনরায় উক্ত হারে গোবর প্রয়োগ করিলে যৌগিক নাইট্রোজেন শতকরা ০'২২ অবধি বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাতে জমি খুব উর্বর হয় এবং তাহাতে প্রভূত ফসল উৎপাদন করা যায়।

নিম গাছের পাতা (*Melia azadiracta* Linn) জমিতে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে জমির যৌগিক নাইট্রোজেন ও ভূমিপ্রাণ বৃদ্ধি পায়। এই নাইট্রোজেন বৃদ্ধির প্রধান কারণ এই যে বায়ুর নাইট্রোজেনও জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত হয়।

শহরের আবর্জনা জমিতে মিশ্রণের ফলে যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এলাহাবাদ শহরের আবর্জনা আমাদের গবেষণাগারের সম্মুখের জমিতে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। ফলে পাঁচ-ছয় বৎসরে জমির নাইট্রোজেন শতকরা ০'০৪ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ০'২৫ পর্যন্ত হইয়াছিল এবং এই জমিতে প্রচুর শস্যও উৎপাদিত হইয়াছিল।

জমিতে হলচালনা করিয়া তাহাতে গোবর মিশ্রিত করিলে জমির ভূমিপ্রাণ ও নাইট্রোজেন বর্ধিত হয়। অথচ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে এই দুই পদার্থ যে অতি সামান্যও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না তাহা রথামস্টেডের একশত বৎসর ব্যাপী পরিচালিত পরীক্ষাতে নির্ধারিত হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষার ফলাফল পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল—

সারণী ১১

১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে জমিতে মোট নাইট্রোজেন শতকরা ০·১২২ ভাগ ছিল।

		অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা জমিতে			সোডিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ করা জমিতে		গোবর ও খড় প্রয়োগ করা জমিতে
এক একর জমিতে পাউণ্ড হিসাবে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হইয়াছিল	০	৪৩	৮৬	১২৯	৪৩	৮৬	২০০
১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে জমিতে মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ	০·১০৪	০·১১১	০·১১৯		০·১১২	০·১১৫	০·২৩৬

ডেনমার্কের আসকভ্ (Askov) কৃষিকেন্দ্রে বহু বৎসর ব্যাপী পরীক্ষায় (১৮৯৪-১৯৪৮ খ্রী.) প্রমাণিত হইয়াছে যে, খড়-মিশ্রিত জমিতে গোবর প্রয়োগ করিলে জমির মোট নাইট্রোজেন শতকরা ১৬ হইতে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সোডিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ করিলে এই বৃদ্ধি অতি সামান্য পরিমাণে হয়। আমেরিকার মিসৌরী (Missouri) কৃষিকেন্দ্রেও অনুরূপ ফলাফল পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং জমিতে নাইট্রোজেনের জৈব যৌগসমূহের বৃদ্ধি রাসায়নিক সার প্রয়োগ দ্বারা সম্ভব নহে। কিন্তু জমিতে গোবর প্রয়োগ করিলে জৈব নাইট্রোজেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মাটিতে গোবর মিশ্রিত করিয়া আমরা যে পরীক্ষা করিয়াছিলাম তাহার ফল নিম্নে দেওয়া হইল—

সারণী ১২

একর প্রতি ৫০ টন গোবর জমিতে প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

	উন্মুক্ত জমিতে সূর্যালোকের প্রভাবে	
	মোট নাইট্রোজেনের শতকরা ভাগ	জৈব কার্বনের শতকরা ভাগ
১২-২-১৯৩৭ (গোবর মিশ্রণের পর)	০·০৩৫৬	০·৭১২৬

	মোট নাইট্রোজেনের শতকরা ভাগ	জৈব কার্বনের শতকরা ভাগ
২৯-৪-১৯৩৭	০'০৪২৪	০'৪৮২৬
১২-৬-১৯৩৭	০'০৪৬৬	০'৩৮২৫
	অন্ধকারে অর্থাৎ কাঠদ্বারা আবৃত জমিতে (অর্থাৎ সূর্যালোকের অভাবে)	
১২-২-১৯৩৭ (গোবর মিশ্রণের পর)	০'০৩৮১	০'৭২১৮
২৯-৪-১৯৩৭	০'০৪০৩	০'৫১৬৮
১২-৬-১৯৩৭	০'০৪২০	০'৪১৫৮

একর প্রতি ২৫ টন মাতগুড় জমিতে মিশ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে—

সারণী ১৩

	সূর্যালোকে	
	মোট নাইট্রোজেনের শতকরা ভাগ	জৈব কার্বনের শতকরা ভাগ
৯-৩-১৯৩৭ (মাতগুড় মিশ্রণের পর)	০'০৩৪৪	১'৭৭০৮
১২-৭-১৯৩৭	০'০৪৫৬	০'৬৮৭৫
২৫-৯-১৯৩৭	০'০৪৬১	০'৪৭২৮
	অন্ধকারে (কাঠদ্বারা আবৃত জমিতে)	
৯-৩-১৯৩৭ (মাতগুড় মিশ্রণের পর)	০'০৩২৮	১'৭৭৩২
১২-৭-১৯৩৭	০'০৩৭৫	০'৭৮৫৪
২৫-৯-১৯৩৭	০'০৩৮৮	০'৪৪৬৮

আমরা খড় (বিচালি) মাটিতে মিশ্রিত করিয়া দেখিয়াছি যে, খড়ের কার্বো-হাইড্রেট ক্রমশ জারিত হইয়া যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই পরীক্ষার ফল সারণী ১৪-তে দেওয়া হইল।

সারণী ১৪

১০০ গ্রাম মাটি এবং ২'৫ গ্রাম গমের খড়

পরীক্ষার সময় তাপমাত্রা ৩০° হইতে ৩৫° সে

	জৈব কার্বনের শতকরা ভাগ	মোট নাইট্রোজেনের শতকরা ভাগ
	সূর্যালোকে	
২৮-৬-১৯৪৭	১'৩৮৬	০'০৫৪৪
১৮-৩-১৯৪৮	০'৯৭৫	০'০৬৪৮
২৮-৬-১৯৪৮	০'৮৫১	০'০৬৭৮
	অন্ধকারে	
২৮-৬-১৯৪৭	১'৩৮৬	০'০৫৪৪
১৮-৩-১৯৪৮	১'১৮১	০'০৫৬৯
২৮-৬-১৯৪৮	১'১০০	০'০৫৭৮

উপরি-উক্ত পরীক্ষায় যে জমি ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাতে শতকরা ০'০৪ ভাগ মোট নাইট্রোজেন, ১ ভাগ ক্যালসিয়াম অক্সাইড অর্থাৎ চুন এবং ০'০৭৯ ভাগ ফস্ফরিক অ্যাসিড (P_2O_5) ছিল। চুন এবং ফস্ফেট-বহুল অপর একটি জমিতেও এ ধরনের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। উহাতে গমের খড় মিশ্রিত করার পর ক্রমশ খড় জারিত হইতে থাকে এবং যৌগিক নাইট্রোজেন পূর্বোক্ত জমি অপেক্ষা এই জমিতে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

চুন-বহুল জমিতে যে পরীক্ষা করা হইয়াছিল নিম্নে তাহার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

সারণী ১৫

এই জমিতে শতকরা ০'২১ ভাগ মোট নাইট্রোজেন, ৩'৪ ভাগ ক্যালসিয়াম অক্সাইড (চুন) ও ০'৪২ ভাগ ফস্ফরিক অ্যাসিড ছিল।

	কৃত্রিম আলোতে	
	জৈব কার্বনের শতকরা ভাগ	মোট নাইট্রোজেনের শতকরা ভাগ
পরীক্ষা আরম্ভের দিন	১·৯৬৭৩	০·২১১৭
৮০ দিন পর	০·৯৭৩৪	০·৩৬০৬
	অন্ধকারে	
পরীক্ষা আরম্ভের দিন	১·৯৬৭৩	০·২১১৭
৮০ দিন পর	১·০৩০০	০·৩১০৮

এই-সব পরীক্ষাতে দেখা যায় যে গোবর মাতগুড় অথবা খড় জমিতে মিশ্রিত করিলে এই-সকল জৈব পদার্থের শক্তিপ্রদায়ক কার্বোহাইড্রেট, সেলুলোজ ইত্যাদি কার্বন-সংযুক্ত পদার্থসমূহ ধীরে ধীরে জারিত হয়। ফলে জৈব কার্বনের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়। আরো দেখা যায় যে, আলোতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় যৌগিক নাইট্রোজেনের পরিমাণবৃদ্ধি অন্ধকারে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার অপেক্ষা অধিক। সুতরাং আলোকের সাহায্যে জৈব পদার্থের জারণের দ্বারা নাইট্রোজেন উৎপন্ন করিয়া জমির উর্বরতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। সূর্যালোক ও বৈদ্যুতিক আলোতেও নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি অন্ধকার অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। অতএব জমিতে যে সূর্যালোক পতিত হয় তাহা তৃণ খড় গোবর কচুরিপানা বা অন্যান্য জৈব পদার্থের সাহায্যে জমির সংযুক্ত নাইট্রোজেন ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের ব্যবহার

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যে-জমিতে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অধিক পরিমাণে থাকে সেই জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি অধিক হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জমি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট -বহুল জমি অধিক উর্বর হয় ও তাহাতে যৌগিক নাইট্রোজেন থাকে অধিক

পরিমাণে। সুতরাং জমির উর্বরতা স্থায়ীভাবে বর্ধিত করিতে হইলে তাহাতে হলচালনা করিয়া গোবর, খড় বা বিচালি, পাতা, মাতগুড় ইত্যাদি সহজলভ্য ও সুলভ জৈব পদার্থ মিশ্রিত করা কর্তব্য এবং জৈব পদার্থসমূহের সহিত ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট বা ইস্পাত কারখানার ধাতুমল মিশ্রিত করা আবশ্যক। জমির নাইট্রোজেন যৌগসমূহ ধীরে ধীরে অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং ইহাই উদ্ভিদ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ফসলের উন্নতি সাধন করে।

ভারতবর্ষের বিহারে এবং ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্তী স্থানে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট পাওয়া যায়। কিন্তু এই ফস্‌ফেটসমূহে ফসলের উপকারী নহে এরূপ পদার্থ, যেমন লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম শতকরা ৮ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত থাকে। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে, যেমন অস্ট্রেলিয়া, উত্তর-আফ্রিকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যাণ্ডের নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটে যে পরিমাণে লৌহ ফস্‌ফেট ও অ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফেট থাকে তাহা ভারতীয় খনিজের তুলনায় কম। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে খনিজ ফস্‌ফেটে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে সুপার-ফস্‌ফেট প্রস্তুত হয়, কিন্তু খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের সহিত যদি শতকরা আট-দশ ভাগ লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফেট থাকে তাহা হইলে ব্যবহারের উপযোগী সুপারফস্‌ফেট প্রস্তুত সম্ভবপর হয় না। খনিজ ফস্‌ফেট রুশদেশে বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু চীন, জাপান, ভারতে অল্প পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ক্ষারকীয় ধাতুমল (basic slag) উপকারী

আমাদের দেশে লৌহ ও ইস্পাত-প্রস্তুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দুই পদার্থ প্রস্তুত করিবার সময় একটি দ্রব্য উপজাত হয়। ইহাকে ক্ষারকীয় ধাতুমল (basic slag) বলে। ইহাতে চুন, ফস্‌ফেট, সিলিকেট, ভ্যানেডিয়াম, লৌহ ও অ্যালু-মিনিয়াম -ঘটিত পদার্থ থাকে। পশ্চিমবাংলার কুলটির ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি ও টাটা কোম্পানির ইস্পাত-কারখানায় যে উপজাত ক্ষারকীয় ধাতুমল পাওয়া যায় তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে

শতকরা আট ভাগ ফস্‌ফরিক অক্‌সাইড (P_2O_5) থাকে।

আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই ক্ষারকীয় ধাতুমলচূর্ণ গোবর মাতগুড় খড় পাতা কচুরিপানা অথবা শহরের আবর্জনার সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ষিত জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির যৌগিক নাইট্রোজেন ও উর্বরতা প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত হয়। কৃষিকার্যে ব্যবহারের জন্য আমেরিকার বাজারে যে ক্ষারকীয় ধাতুমল (basic slag) বিক্রয় হয় তাহাতে আট হইতে দশ ভাগ ফস্‌ফরিক অক্‌সাইড (P_2O_5) থাকে। সুতরাং আমাদের দেশের ক্ষারকীয় ধাতুমলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কৃষির উন্নতিকল্পে জৈব পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা ব্যবহারযোগ্য।

ভারতবর্ষ মৃত জন্তুর অস্থি ইত্যাদি অধিকাংশই বিদেশে বিক্রয় করে। অস্থি বিদেশে রপ্তানি করা অতিশয় গর্হিত কার্য। অস্থিচূর্ণে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট থাকে। অস্থিতে যৌগিক নাইট্রোজেন রহিয়াছে শতকরা তিন হইতে চারি ভাগ। ধাতুমল ও অস্থিচূর্ণ এই দুই দ্রব্য জমির উর্বরতা বর্ধক ও শস্য উৎপাদনের সহায়ক।

শতবর্ষেরও অধিক পূর্বে বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক ব্যারন লাইবিগ (Liebig) অতিশয় বিরক্তির সহিত লিখিয়াছিলেন যে, ইংরাজ জাতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে অস্থি সংগ্রহ করিয়া ঐ-সকল দেশের জমির উর্বরতা হ্রাস করিয়া দিতেছে এবং সংগৃহীত অস্থি নিজদেশে কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যবহার করিতেছে। এমন-কি, ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রের কবরসমূহ হইতেও তাহারা অস্থি-সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে রপ্তানি করিতেছে।"

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বহু কৃষিক্ষেত্রে এক একর জমিতে এক টন পর্যন্তও অস্থিচূর্ণ সার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। লাইবিগ জানিতেন যে, অস্থিচূর্ণ শস্যের অতি উত্তম খাদ্য। এই কারণে তিনি জার্মানী ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত অস্থিসমূহ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতেছে দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেন।

বিদেশে অস্থি প্রেরণ অতি অন্যায়, ভারতবর্ষ হইতে অস্থি রপ্তানি সম্পূর্ণরূপে

বন্ধ করিতে হইবে। ভারতীয় কৃষির উন্নতিকল্পে অস্থিচুর্ণ জৈব পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ অবশ্যকর্তব্য।

সুপারফস্‌ফেটের ব্যবহার

আমেরিকা ও ইউরোপের উন্নতিশীল জাতিগণ অস্থি বা খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিয়া ক্যালসিয়াম সুপারফস্‌ফেট প্রস্তুত করেন।

বর্তমানে প্রতি বৎসর পৃথিবীতে প্রায় দুই কোটি টন সুপারফস্‌ফেট প্রস্তুত হয়। এবং এই সুপারফস্‌ফেটের ব্যবসায় রাসায়নিক সারের ব্যবসায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অস্থি, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট ক্ষারকীয় ধাতুমলের (basic slag) ফস্‌ফেট অংশ জলে দ্রবীভূত হয় না, ফলে উদ্ভিদের মূল তাহা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে না। সেইজন্য প্রায় এক শত বৎসর যাবৎ সুপারফস্‌ফেটের উৎপাদন চলিয়া আসিতেছে। তাহার কারণ এই যে, ক্যালসিয়াম সুপারফস্‌ফেট জলে বা লঘু অম্লতে খুব সহজেই দ্রবীভূত হয়। রথামস্টেড কৃষি-পরীক্ষা-কেন্দ্রের স্থাপয়িতা সার জন বেনেট লস (Sir John Bennett Lawes) ১৮৪৪ সালে সুপারফস্‌ফেট প্রস্তুত করার ব্যবসায় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, রথামস্টেডের জমিতে অস্থিচুর্ণ প্রয়োগ করিলে তাহাতে শালগম বা আলুর ফসল অল্প পরিমাণে বর্ধিত হয়, কিন্তু অস্থি ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে সুপারফস্‌ফেট প্রস্তুত করিয়া তাহা জমিতে প্রয়োগ করিলে সেই জমিতে শালগম বা আলুর ফসল বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডে শীতকালে তুষারপাতের দরুন গবাদি পশু যখন মাঠে চরিতে পারে না তখন তাহাদিগকে শালগম ইত্যাদি আহার করিতে দেওয়া হয়।

সুপারফস্‌ফেট প্রথমে অল্প পরিমাণে অস্থি হইতে ও পরে অধিক পরিমাণে খনিজ ফস্‌ফেট হইতে প্রস্তুত হইত। বর্তমান কালেও উৎকৃষ্ট খনিজ ফস্‌ফেট হইতেই ইহা প্রস্তুত হয়। সুপারফস্‌ফেট জমিতে প্রয়োগ করিলে উহা জমির ক্যালসিয়ামের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় ক্যালসিয়াম ট্রাই ফস্‌ফেট

[$Ca_3(PO_4)_2$] এবং ক্যালসিয়াম ডাই ফস্‌ফেট [$Ca_2(HPO_4)_2$] সৃষ্টি করে। এই দুই ফস্‌ফেট ক্যালসিয়াম সুপারফস্‌ফেট অথবা মনোক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অপেক্ষা জলে কম দ্রবণীয় কিন্তু ডাইক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট ট্রাইক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অপেক্ষা জলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে দ্রবণীয়। অস্থি, খনিজ ফস্‌ফেট অথবা ধাতুমলে যে-কোনো অবস্থাতেই থাক্‌-না কেন ট্রাইক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অতি অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হইয়া ফসলের উন্নতি করে। ইহার কারণ এই যে, কার্বনিক অ্যাসিড, ট্রাইক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটকে ডাইক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটে এবং অল্প পরিমাণে মনো-ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটে পরিণত করিতে পারে। অর্থাৎ জমিতে খনিজ ফস্‌ফেট, অস্থিচূর্ণ অথবা ধাতুমল প্রয়োগ করিয়া কার্বনিক অ্যাসিডের সাহায্যে যে পরিমাণ ফস্‌ফেট দ্রবণীয় হইয়া ফসলের উপকারে আসে তাহা সাধারণত সুপারফস্‌ফেট-প্রযুক্ত জমি হইতে কার্বনিক অ্যাসিডের সাহায্যে প্রাপ্ত ফস্‌ফেট অপেক্ষা অল্প। এই কারণে উন্নতিশীল জাতিগণ জমিতে অধিক পরিমাণে সুপারফস্‌ফেট ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং অল্প পরিমাণে অস্থিচূর্ণ বা খনিজ ফস্‌ফেট সুপারফস্‌ফেট প্রস্তুত না করিয়া প্রয়োগ করেন। অম্লভাবাপন্ন জমিতে ফস্‌ফেট পাথর চূর্ণ বা ক্যালসিয়াম ট্রাই ফস্‌ফেটের উপকারিতা অনেক সময় সুপারফস্‌ফেট হইতে বেশি হইয়া থাকে।

সার হিসাবে জৈব পদার্থের ব্যবহার

আমাদের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, কার্বনিক অ্যাসিডের সাহায্যে সুপারফস্‌ফেট অপেক্ষা সুলভ খনিজ ফস্‌ফেট বা ক্ষারকীয় ধাতুমল (basic slag) ধীরে ধীরে ক্যালসিয়াম ডাই ফস্‌ফেট ও ক্যালসিয়াম মনো ফস্‌ফেটে পরিণত হইয়া শস্যকে ফস্‌ফেট সরবরাহ করিতে পারে। জমিতে কার্বনিক অ্যাসিড বৃদ্ধি করিতে হইলে জৈব কার্বন, যেমন, গোবর খড় পাতা তৃণ বিচালি কচুরিপানা এমন-কি, কাঠ অথবা কয়লার গুঁড়া সংমিশ্রণের প্রয়োজন। উপরি-উক্ত পদার্থসমূহ মাটিতে মিশ্রিত করিলে তাহা ধীরে ধীরে অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হয় এবং জমিতে

কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি উৎপাদিত হইতে থাকে। সুতরাং জৈব কার্বন ও খনিজ ফস্‌ফেট অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল যে কেবলমাত্র জমিতে নাইট্রোজেন-সংযুক্ত পদার্থই বৃদ্ধি করে তাহা নহে, এই দুই পদার্থের সংমিশ্রণে জমিতে সহজলভ্য ফস্‌ফেটের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। পরন্তু সকল জাতীয় জৈব (কার্বন-যুক্ত) পদার্থে, যেমন, গোবর তৃণ পাতা খড় কচুরিপানা কাঠের গুঁড়া ইত্যাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশ, চুন ও জীবাণু থাকে। এই-সকল পদার্থ কৃষির সহায়ক। এই কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই জৈব পদার্থসমূহ ও খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল ব্যবহারে কৃষির প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কৃত্রিম নাইট্রোজেন-সংযুক্ত পদার্থ ব্যবহার না করিলেও জৈব (কার্বন-যুক্ত) পদার্থ, খনিজ ফস্‌ফেট অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল শস্যের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ, সহজলভ্য ফস্‌ফেট, পটাশ, চুন, অণুপোষকসমূহ (trace elements) ও জীবাণু সরবরাহ করিয়া কৃষির উন্নতিসাধন করে।

আমাদের দেশে জমির উন্নতিকল্পে বর্ষার প্রারম্ভে সবুজ সার (green manure) ব্যবহৃত হইতেছে। ধইঞ্চা, শণ ইত্যাদি উদ্ভিদ সবুজ সাররূপে ব্যবহার করা হয়। শীতপ্রধান দেশে সবুজ সার হিসাবে clover, alfalfa, lucerne ইত্যাদির বহুল ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। এই উপায় অবলম্বনের ফলে আজকাল ৫০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন পৃথিবীর কৃষিক্ষেত্রসমূহে বাড়িতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ করিয়াছেন যে, এই-সকল উদ্ভিদের মূলে রাইজোবিয়া (Rhizobia) জাতীয় জীবাণু প্রবেশ করে এবং এই উদ্ভিদে সূর্যালোকের সাহায্যে প্রস্তুত কার্বোহাইড্রেটের জারণজনিত উদ্ভূত শক্তির সাহায্যে রাইজোবিয়া জীবাণু বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেনকে আত্মীকরণ করিয়া থাকে এবং উহা উদ্ভিদের মূলে ক্ষুদ্র গুটির আকারে সঞ্চিত হয়। সুতরাং এইরূপ উদ্ভিদক্ষেত্র চাষ করিলে বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে জমির নাইট্রোজেন যৌগসমূহ ও উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। শিমবর্গীয় উদ্ভিদ (এর মধ্যে যে-সকল উদ্ভিদে ডাল জন্মে তাহাও আছে) এই প্রকার রাইজোবিয়া জীবাণুর সাহায্যে জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে। সকল

দেশেই এই জাতীয় উদ্ভিদ (legumes) জন্মাইয়া জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেন ও উর্বরতাবৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে এবং ইহাই বর্তমান যুগের কৃষির উন্নতির প্রধান অঙ্গ। সাধারণ তৃণ অপেক্ষা শিমবর্গীয় উদ্ভিদে নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ এবং চুন অধিক পরিমাণে থাকে। এই কারণে গৃহপালিত পশুর পুষ্টির জন্য শিমবর্গীয় উদ্ভিদসমূহ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। যে-সকল দেশে দুগ্ধ অধিক উৎপাদিত হয় সেই-সকল দেশে গবাদি পশুর আহারের নিমিত্ত শিমবর্গীয় উদ্ভিদের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জমিতে ক্ষারকীয় ধাতুমল বা খনিজ ফস্ফেট প্রয়োগ করিলে এই-সকল উদ্ভিদ সহজে বৃদ্ধি পায় এবং জমিতে অধিক পরিমাণে জৈব নাইট্রোজেন সৃষ্টি করে। এই হেতু শীতপ্রধান দেশসমূহের সর্বত্রই ধাতুমলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। তৃণভূমিতে ক্ষারকীয় ধাতুমল প্রয়োগ করিলে তৃণও সহজে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্ষারকীয় ধাতুমল প্রয়োগে শিমবর্গীয় উদ্ভিদেরই বৃদ্ধি হয় অধিক পরিমাণে। নাইট্রোজেন আত্মীকরণ পদ্ধতিতে সামান্য পরিমাণে মলিবডেনামের প্রয়োজন, ক্ষারকীয় ধাতুমলে এই অনুপোষক থাকে— এইজন্যই ইহার প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত ভালো ফল পাইবার সম্ভাবনা।

আমাদের গবেষণায় পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, কর্ষিত জমিতে শিমবর্গীয় উদ্ভিদ শণ, clover বা lucerne ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া দিলে বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি হয়। ক্ষারকীয় ধাতুমল বা খনিজ ফস্ফেট চূর্ণ শণ বা ধইঞ্চার সহিত মিশ্রিত করিলে অধিকতর পরিমাণে যৌগিক নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এই কারণে যে ক্ষেত্রে সবুজ সার জমির উর্বরতাবৃদ্ধিকল্পে ব্যবহৃত হয় সেই-সব ক্ষেত্রেই ক্ষারকীয় ধাতুমল অথবা ফস্ফেটচূর্ণ মিশ্রিত করা অবশ্য-কর্তব্য।

পৃথিবীতে এইরূপ বহু বৃক্ষ ও গুল্ম রহিয়াছে যাহাদের মূলে জীবাণুর সাহায্যে নাইট্রোজেন সংযুক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য শীতপ্রধান দেশে শিমবর্গীয় উদ্ভিদের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে।

অনেকে মনে করেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিক্ষেত্রে প্রতি বৎসর বিশ লক্ষ টন

যৌগিক নাইট্রোজেন যোগ হইতেছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন যৌগিক নাইট্রোজেন সৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসর পশুর খাদ্য ও ক্ষেত্রের উর্বরতাবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। আমাদের দেশেও শিমজাতীয় উদ্ভিদের চাষ বৃদ্ধি করিয়া সহজ উপায়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

বর্তমানে পৃথিবীতে গন্ধক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের অভাব ঘটিয়াছে এবং এই কারণে সালফিউরিক অ্যাসিডের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। সালফিউরিক অ্যাসিডের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার দরুন সুপারফস্‌ফেটও মহার্ঘ হইয়াছে। এইজন্য খনিজ ফস্‌ফেট সুপারফস্‌ফেটে পরিণত না করিয়া কৃষিতে ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে।

আমাদের গবেষণায় পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, জৈব (কার্বন-যুক্ত) পদার্থের সহিত চূর্ণ খনিজ ফস্‌ফেট মিশ্রিত করিলে বায়ুর নাইট্রোজেন-আত্মীকৃত এবং ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট সহজলভ্য হয়। ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আমরা আরো দেখিয়াছি যে, শীতপ্রধান দেশের জমিতে লৌহের ও অ্যালুমিনিয়ামের ফস্‌ফেট থাকে এবং কার্বনিক অ্যাসিড এই দুই ফস্‌ফেটকে জলে দ্রবীভূত করিতে পারে না। এই কারণে ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাটিতে কার্বন-যুক্ত পদার্থ মিশ্রিত করিলে যে পরিমাণ উপকার হয় ইউরোপের ন্যায় শীতপ্রধান দেশের জমিতে উহা মিশ্রিত করিলে সেই পরিমাণ উপকার হয় না। কিন্তু ইউরোপের জমিতে যদি খড়িমাটি বা চুন মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে সেই জমিতে লৌহ ফস্‌ফেট, অ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফেট ও টাইটেনিয়াম ফস্‌ফেট খড়িমাটি বা চুনের দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কতকাংশে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটে পরিণত হয়। এই সদ্যোজাত ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট জৈব কার্বন-যুক্ত পদার্থের সাহায্যে জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেন বর্ধন করে, ফলে জমি উর্বর হয়।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ইংরেজ সরকার কৃষির উন্নতিকল্পে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কৃষকগণকে সস্তায় চুন (খড়িমাটি) ও ক্ষারকীয় ধাতুমল সরবরাহ করিতেছেন। ইংলণ্ডের শস্য এবং তৃণ উৎপাদনের জমিসমূহের অধিকাংশই আম্লিক। চুন ও ধাতুমল ক্ষারকীয় পদার্থ। এই কারণে এই-সকল পদার্থ জমির অম্লভাব দূর করিতে

পারে এবং জৈব পদার্থের সাহায্যে জমিতে আত্মীকৃত নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং ইংরাজ সরকারের এই পরিকল্পনা কৃষির উন্নতির সহায়ক ও স্থায়ী উপকারসাধনকারী। কারণ, স্থায়ীভাবে জমির উন্নতিসাধন করিতে হইলে জমিতে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট ও ভূমিপ্রাণ বর্ধন অবশ্য-কর্তব্য।

এতদিন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ প্রচার করিয়াছেন যে, শিমবর্গীয় উদ্ভিদ (legume) ব্যতীত জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি বা বৃদ্ধি অসম্ভব। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে জমিতে ধাতুমল বা ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট প্রয়োগ করিলে শিমবর্গীয় উদ্ভিদের (legume) উৎপাদন ও জমির জৈব নাইট্রোজেন অধিকতর পরিমাণে বর্ধিত হয়। পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বহু গবেষণা করিয়া আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে, জমিতে মিশ্রিত হইলে সকল প্রকার জৈব পদার্থেরই কার্বন জারিত হইতে থাকে এবং ফলে যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়াতে ক্যাল-সিয়াম ট্রাই ও ডাই ফস্‌ফেট, ধাতুমল বা খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট বিশেষ সহায়ক। কিন্তু লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম অথবা টাইটেনিয়াম ফস্‌ফেট এই প্রক্রিয়াতে কার্যকর নহে। সূর্যের আলোকে এই উপায়ে জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি অধিক হয়। আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, এই প্রক্রিয়াতে পৃথিবীর সকল দেশের জমিতে প্রচুর যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি হয়। গোবর তৃণ ইত্যাদি জৈব পদার্থের সহিত যে-সকল নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ জমিতে স্বাভাবিকভাবে যোগ হয় সেই নাইট্রোজেন এবং জৈব কার্বনের ধ্বংসে উৎপাদিত শক্তি হইতে ও আলোকের শক্তির সাহায্যে বায়ুর যে নাইট্রোজেন জমিতে আত্মীকৃত হয়— এই দুই প্রকারে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ হইতে পৃথিবীর অধিকাংশ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সংযুক্ত নাইট্রোজেন জমিতে প্রথমে ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া ও পরে নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং ফসলের বৃদ্ধির জন্য সহজলভ্য নাইট্রোজেন সরবরাহ করিতে থাকে। দেখা গিয়াছে যে, ইহাই সহজে এবং সুলভে কৃষির উন্নতি করিবার প্রধান সোপান ও সকল দেশেই ইহা প্রযোজ্য। শীতপ্রধান দেশে জৈব পদার্থ

মাটিতে মিশ্রিত করিয়া যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করিতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা অধিকতর সময় লাগে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে কৃষির উন্নতিকল্পে সার ব্যবহৃত হইতেছে। গোবর বা অন্যান্য পশুপক্ষীর মলমূত্র প্রাচীন কালে সার হিসাবে ব্যবহৃত হইত। গ্রীস ও রোম দেশেই সম্ভবত শিমবর্গীয় উদ্ভিদের (legume) সার হিসাবে ব্যবহার আরম্ভ হয়। শিমবর্গীয় উদ্ভিদের ব্যবহারে পরবর্তী ফসলের উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আধুনিক রসায়নশাস্ত্র ও প্রাণীবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা লাভোয়াসিয়ে (A. Lavoisier, ১৭৪৩-৯৪) লক্ষ করিয়াছিলেন যে, যে জমিতে তৃণ জন্মে সেই জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, তৃণের জৈব পদার্থ ধীরে ধীরে মাটির সহিত মিশ্রিত হয় ও অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে এবং এই পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদিত হয়। এই শক্তি বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেনকে যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত করিয়া জমির উর্বরতা বর্ধন করে। তৃণ জন্মে এরূপ জমিতে ধাতুমল বা চুর্ণ খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট প্রয়োগ করিলে এই যৌগিক নাইট্রোজেন সৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শিমবর্গীয় উদ্ভিদ তৃণের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় না থাকিলেও এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই কারণে জমিতে তৃণের আস্তরণ জন্মানোই অতি সহজে উর্বরতা বৃদ্ধি করিবার উপায়।

আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এলাহাবাদে সাধারণ জমিতে শতকরা ০.০৩৯ ভাগ মোট নাইট্রোজেন থাকে। এই-সকল জমিতে তৃণ জন্মাইলে ও সংবৎসর-ব্যাপী তৃণের আস্তরণ থাকিলে এক বৎসর পর জমির মোট নাইট্রোজেন শতকরা ০.০৭৮ ভাগ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ছয় মাস তৃণের আস্তরণ রাখিলে নাইট্রোজেন শতকরা ০.০৬৪ ভাগ হয়।

ইংলণ্ডের রথামস্টেডে একখানি জমিতে বিশ বৎসর ব্যাপী তৃণ জন্মানো হইয়াছিল। সেই তৃণে একটিও শিমজাতীয় উদ্ভিদ ছিল না। তথাপি জমির মোট নাইট্রোজেন বিশ বৎসরে এক একর জমিতে ২০ কেজি নাইট্রোজেন বর্ধিত

হইয়াছিল। কৃষিতে তৃণের উপকারিতা সম্পর্কে আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও এই প্রকার তথ্যই পাওয়া গিয়াছে।

জমিতে গোবর প্রয়োগ করিলে গোবরে যে-সকল উদ্ভিদখাদ্য আছে তাহা ফসলের উন্নতি করে ও গোবরের কার্বোহাইড্রেটসমূহ জমিতে জারিত হইয়া শক্তি উৎপাদন করিতে থাকে এবং সেই শক্তি ও আলোকরশ্মি জমিতে বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। জমিতে লাঙল চালাইয়া তৃণ মিশ্রিত করিলে একই প্রকারে জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি ও তাহাতে জমির উর্বরতা বর্ধিত হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, জমিতে তৃণ উৎপাদন কৃষির উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। এইজন্য ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষির জমিতে দুই-তিন বৎসর পর পর তৃণ জন্মানো হয়। গৃহপালিত পশুগণ সেই তৃণ আহার করিয়া জীবনধারণ করে এবং দুই-তিন বৎসর পর সেই জমিতে কৃষিকার্য করা হইলে বহুল পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে বহু তৃণের জমি লাঙল দিয়া চাষ করিয়া তাহাতে শস্য উৎপাদন করা হইয়াছিল এবং দেখা গিয়াছিল যে কোনো কোনো জমিতে আশানুরূপ শস্য উৎপাদিত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে উক্ত জমিসমূহে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের পরিমাণ হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট যৌগিক নাইট্রোজেন বর্ধনে সহায়ক এবং ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট বৃদ্ধি করিলে যৌগিক নাইট্রোজেন ও উর্বরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর যাবৎ বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদের উপকারী পদার্থ ও পোষক সম্পর্কে দুই মত প্রচার করিয়াছেন।

বেরনার্ড পালিসি (Bernard Palissy, ১৫১০-৮৯), বেকন (Bacon, ১৫৬১-১৬২৬), গ্লবার (Glauber, ১৬০৪-৬৮), বয়েল (Boyle, ১৬২৭-৯১) এবং বিশেষ করিয়া লাইবিগ (Liebig, ১৮০৩-৭৩) বিশ্বাস করিতেন যে লবণ-জাতীয় পদার্থই উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। প্যারাসেলসাস (Paracelsus, ১৪৯৩-১৫৪১) এই মত প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন।

অপর মতবাদটি প্রচার করেন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। তাঁহার মতে উদ্ভিদ মাটির জৈব পদার্থ দ্বারা পুষ্ট হয়। এই মতাবলম্বীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ রহিয়াছেন— হোম (Home, ১৭১৯-১৮১৩), ওয়ালেরিয়ুস (Wallerius, ১৭০৯-৮৫), থায়ের (Thaer, ১৭৫২-১৮২৮), দ্য সসার (De Saussure, ১৭৬৭-১৮৪৫), ডেভি (Davy, ১৭৭৮-১৮২৯), দ্য কাণ্ডোল (De Candolle, ১৭৭৮-১৮৪১), বারজেলিয়ুস (Berzelius, ১৭৭৯-১৮৪৮), মুল্ডার (Mulder, ১৮০২-৮০)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মানব সভ্যতার প্রারম্ভ হইতেই জৈব পদার্থ সার হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কেবলমাত্র একশত বৎসর যাবৎ উন্নত জাতিগণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতেছেন। চীন, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের অধিবাসিগণ রাসায়নিক সার প্রায় একেবারেই ব্যবহার করিতেন না। বর্তমানে ব্যবহার বাড়িয়াছে।

গোবর তৃণ কিংবা শণ-জাতীয় পদার্থে কার্বোহাইড্রেটের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট ও লবণের ন্যায় অন্যান্য দ্রব্যও থাকে। প্রোটিন বায়ুর অম্লজানের সাহায্যে জারিত হইয়া প্রথমে অ্যামোনিয়া ও পরে নাইট্রেটে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গোবর বা অন্যান্য জৈব পদার্থ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত হয়। এই-সকল বস্তু লবণ-জাতীয়। সুতরাং জৈব পদার্থ কালক্রমে জমিতে লবণ-জাতীয় দ্রব্যে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের বর্ধনের সহায়তা করে।

রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের মূল্য অধিক

আমাদের দেশের বহুলোকের ধারণা এই যে, সিন্ধ্রির ন্যায় রাসায়নিক সারের কলকারখানা আরো কয়েকটি প্রস্তুত করিলে ভারতবর্ষের খাদ্যাভাব দূর হইবে। কিন্তু ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার্ জন রাসেলের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সম্মিলিত বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর শতকরা কেবলমাত্র তিন ভাগ খাদ্য রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের সাহায্যে উৎপাদিত হইয়া থাকে এবং অবশিষ্ট ৯৭ ভাগ খাদ্যই জমির যৌগিক নাইট্রোজেন হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং জমিতে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ দ্বারা কৃষির উন্নতি করা অপেক্ষা অল্লায়াসে জমির উর্বরতা-বৃদ্ধি করিয়া কৃষির উন্নতিসাধন সহজসাধ্য।

এই প্রসঙ্গে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত খ্যাতনামা 'নেচার' (Nature) পত্রিকায় ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে যে মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> 'বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের কেবলমাত্র শতকরা তিন ভাগ রাসায়নিক সারের সাহায্যে উৎপন্ন হয়। সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণ একশত কোটি লক্ষ টন। উৎপাদন আরো শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইলে কৃত্রিম নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিবার কারখানার সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এবং এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে ১৫ বৎসর সময় এবং একশত পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ দুই হাজার একশত কোটি টাকা লাগিবে' (বর্তমান হিসাবে ইহা দুই লক্ষ কোটি টাকারও অধিক)।

পৃথিবীর বিভিন্ন কলকারখানায় রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার উৎপাদন করিবার পদ্ধতি মূলত তিনটি। প্রথম পদ্ধতিটির নাম বার্কল্যাণ্ড-আইড (Birkeland-Eyde-Method)। ইহা এই যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়। এই প্রণালীতে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হইত তাহার মধ্যে কেবল শতকরা এক হইতে দুই ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করিতে কার্যকর হইত। শতকরা ৯৮-৯৯ ভাগ শক্তির অপচয় ঘটিত। এই কারণে এই অপচয়মূলক পদ্ধতি সকল দেশেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অপর দুইটি পদ্ধতির একটির নাম হাবের-বশ (Haber-Bosch) পদ্ধতি

ও অপরটির সিয়ানামাইড (Cyanamide) পদ্ধতি। এই দুই পদ্ধতি অনুসারে নাইট্রোজেন যৌগ প্রস্তুত করিতে শতকরা ৮ হইতে ১০ ভাগ শক্তি কাজে লাগে এবং অধিকাংশ শক্তির অপচয় ঘটে।

এজন্য রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রস্তুত প্রণালী অপচয়মূলক ও ইহার ব্যবসায় বৃদ্ধি হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীতে ১৯৩৮ হইতে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার উৎপাদন মাত্র শতকরা তিন ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ সুপারফস্‌ফেট প্রস্তুতের ব্যবসায় এই সময়ের মধ্যে শতকরা ১৫-১৬ ভাগ বর্ধিত হইয়াছে। রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের উৎপাদন অপচয়মূলক বলিয়া ইহার মূল্য অন্যান্য রাসায়নিক সার অপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে, পৃথিবীতে ৩৫.৪ লক্ষ টন রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্তমানে ইহা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এক একর জমিতে প্রচুর পরিমাণে গম ধান্য বা আলু উৎপাদন করিতে ১২ হইতে ২৫ কেজি রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু উন্নত জাতিগণ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি একরে এই পরিমাণে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করেন নাই।

বিভিন্ন দেশে একর-প্রতি যে পরিমাণ (পাউণ্ডে) রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা হইত (১৯৬০) তাহা নিম্নের সারণীতে প্রদত্ত হইল—

সারণী ১৬

বেলজিয়াম	২৮.৫	ইটালী	৪.৩
হল্যাণ্ড	২৪.৮	ফ্রান্স	৪.০
জার্মানী	১৫.৬	ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ	২.৫
ডেনমার্ক	১০.৩	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১.৪
নরওয়ে	৬.০	পোল্যাণ্ড	০.৭৩
সুইডেন	৫.২	হাঙ্গেরী	০.১৫

বর্তমানে (১৯৭৫-৭৬) এই পরিমাণ যাহা হইয়াছে তাহা সারণী ১৭তে (কেজিতে) প্রদত্ত হইল—

সারণী ১৭

হল্যাণ্ড	৯০'৩	সুইডেন	২৪'৭
ডেনমার্ক	৪৭'৯	ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ	২৩'৪
বেলজিয়াম	৪৫'৪	ফ্রান্স	২২'০
নরওয়ে	৪৫'৪	ইটালী	১৭'২
জার্মানী	৪৪'৯	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৯'২
পোল্যাণ্ড	২৬'৫		

উপরোক্ত সারণী হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণ রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা প্রয়োজন বাণিজ্য ও শিল্প -মূলক সভ্য জাতিগণও তাহা অপেক্ষা অনেক কম রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ফসল জন্মাইবার জন্য ব্যবহার করেন। বর্তমানে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার এই-সকল দেশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজন অপেক্ষা ব্যবহারের পরিমাণ অনেক কম। ইহার প্রধান কারণ এই যে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার মহার্ঘ এবং অধিক পরিমাণে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করিলে কালক্রমে জমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে বলিয়া কৃষকগণের মনে ভয় হয় এবং তাহা অমূলক নহে। বহুকাল-ব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, জমিতে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার (অ্যামোনিয়াম সালফেট) প্রয়োগ করিলে জমির চুন ও ক্ষার -জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে দ্রবণীয় হইয়া নিষ্কাশিত হয় ও জমি আম্লিক হইতে থাকে। শীতপ্রধান দেশে জমি আম্লিক হওয়ার আশঙ্কা যে বেশি তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই কারণে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য ব্যতীত অন্যান্য উন্নত দেশে অ্যামোনিয়াম সালফেট কৃষিকার্যে প্রায়শঃ ব্যবহৃত

হয় না। সেই-সকল দেশে সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দুই রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহারে জমির অম্লভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তবে স্থান-বিশেষে সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহারে জমিতে ক্ষারকীয়ভাব বৃদ্ধি পাইতে এবং জমির ভৌত (physical) ধর্ম খারাপ হইতে দেখা গিয়াছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, জমিতে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করিলে প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ প্রথমে অ্যামোনিয়া, পরে নাইট্রাইট এবং পরি-শেষে নাইট্রেটে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই প্রক্রিয়াতে জমিতে অস্থায়ী অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছি যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট অতি সহজেই বিয়োজিত (decomposed) হইয়া নাইট্রোজেন গ্যাস ও জলে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াতে জমিতে প্রযুক্ত সার কিংবা জমিতে যে সার থাকে তাহা হ্রাস পায়, জমিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট সার হিসাবে প্রয়োগ করিলেও এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলে প্রদত্ত নাইট্রোজেন ক্ষয় হয়।

জৈব পদার্থ মোট নাইট্রোজেনের ক্ষয় হ্রাস করে

আমাদের গবেষণার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সারণী ১৮

পরীক্ষার সময় তাপমাত্রা ৩৫° সে

মাটির সহিত মিশ্রিত পদার্থ	সংমিশ্রণের পর উত্তীর্ণ সময়	নাইট্রোজেন ক্ষয়ের শতকরা ভাগ	
		সূর্যালোকে	অন্ধকারে
অ্যামোনিয়াম সালফেট	২ মাস	৫৫.৫	৪০.২
অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট	২ মাস	৬৭.৫	৫৮.৪
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	২ মাস	২৮.৯	২১.০

মাটির সহিত মিশ্রিত পদার্থ	সংমিশ্রণের পর উত্তীর্ণ সময়	নাইট্রোজেন ক্ষয়ের শতকরা ভাগ	
		সূর্যালোকে	অন্ধকারে
ইউরিয়া	৫½ মাস	৪৭'৪	৩৫'১
জিলেটিন	৪½ মাস	৪০'১	২৩'২
খৈল	৫½ মাস	৩৫'৯	২৯'০
পশুর রক্ত	৬ মাস	৫৪'১	৪৮'৭

সারণী ১৯

পরীক্ষার সময় তাপমাত্রা ৩০° সে

৩০০ গ্রাম মাটি + ০'৭০৭৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট (শতকরা ০'০৫ ভাগ নাইট্রোজেন)

	নাইট্রোজেন ক্ষয়ের শতকরা হার	
	বৈদ্যুতিক আলোকে	অন্ধকারে
এক মাস পর	৩৬'৭	২৫'২
দুই মাস পর	৬০'৮	৪২'৫

সারণী ২০

পরীক্ষার সময় তাপমাত্রা ৩০° সে

৩০০ গ্রাম মাটি + ০'৭০৭৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট + ৩ গ্রাম গমের খড়

	নাইট্রোজেন ক্ষয়ের শতকরা হার	
	বৈদ্যুতিক আলোকে	অন্ধকারে
এক মাস পর	১৬'৭	১০'৬
দুই মাস পর	২৯'৯	১৮'৬

সারণী ২১

পরীক্ষার সময় তাপমাত্রা ৩০° সে

৩০০ গ্রাম মাটি + ০.৯১১ গ্রাম সোডিয়াম নাইট্রেট (মোট নাইট্রোজেন ০০৫%)

	নাইট্রোজেন ক্ষয়ের শতকরা হার	
	বৈদ্যুতিক আলোকে	অন্ধকারে
এক মাস পর	১৬.৬	১২.৬
দুই মাস পর	২৫.৬	২২.৯

সারণী ২২

পরীক্ষার সময় তাপমাত্রা ৩০° সে

৩০০ গ্রাম মাটি + ০.৯১১ গ্রাম সোডিয়াম নাইট্রেট + ৩ গ্রাম গমের খড়

	নাইট্রোজেন ক্ষয়ের শতকরা হার	
	বৈদ্যুতিক আলোকে	অন্ধকারে
এক মাস পর	৭.৬	৪.৭
দুই মাস পর	১৩.১	৭.৩

উক্ত সারণীসমূহ হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, জমিতে নাইট্রোজেনের যৌগ প্রয়োগের পর জমি কর্ষিত হইলে ধীরে ধীরে নাইট্রোজেনের ক্ষয় হয়। জমির তাপ অধিক হইলে এই ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সূর্যালোক বা বৈদ্যুতিক আলোকে ক্ষয়ের পরিমাণ অন্ধকারে যে ক্ষয় হয় তাহা অপেক্ষা অধিক। অ্যামোনিয়াম সালফেটের সহিত যদি খড় মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে নাইট্রোজেনের ক্ষয়ের মাত্রা হ্রাস হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সোডিয়াম নাইট্রেট জমিতে মিশ্রিত করিলেও যৌগিক নাইট্রোজেনের ক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু অ্যামোনিয়াম সালফেট মিশ্রিত করিলে যে পরিমাণ ক্ষয় হয় সোডিয়াম নাইট্রেটে খড় মিশ্রিত করিলে ক্ষয় আরো হ্রাস পায়। এই কারণে রাসায়নিক নাইট্রোজেন যৌগসমূহ সার হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে ইহার সহিত জৈব পদার্থ— যেমন

খড় তৃণ গোবর ইত্যাদি— ব্যবহার করা উচিত। তাহা হইলে জমি হইতে নাইট্রোজেনের ক্ষয় কম হইবে এবং যে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা জমিতে অধিক দিন অবস্থান করিয়া ফসলের উন্নতিসাধন করিবে।

বার্লিনে ডালহেমস্থ (Berlin-Dahlem) কৃষিকেন্দ্রে খড়ের সহিত রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং সেই ক্ষেত্রে আলু রোপণ করিয়া যে ফসল পাওয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল—

প্রতি হেক্টরে (এক হেক্টর = ২½ একর) বিনা খড়ে ৭০ সের রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে = ১৪·২ টন আলু, প্রতি হেক্টরে ৭০ সের রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার এবং ৮·৬ টন খড় সহযোগে = ১৭·৮ টন আলু। প্রতি হেক্টরে খড় ব্যতিরেকে ১০০ সের রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া = ১৫ ৮ টন আলু। প্রতি হেক্টরে ৮·৬ টন খড় ১০০ সের রাসায়নিক সার সংযোগে = ১৮·০ টন আলু।

উল্লিখিত ফলাফলে দেখা যাইতেছে যে, আলুর চাষে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের সহিত খড় মিশ্রিত করিলে নাইট্রোজেনের উপকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদিত হয়। আমাদের গবেষণা হইতে এই ফলাফল সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। খড় মিশ্রিত করিলে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের ক্ষয় হ্রাস পায় এবং সার জমিতে অধিক কাল অবস্থান করিয়া ফসলের উন্নতি করে।

ইংলণ্ডের নরফোক প্রদেশে জমিতে অ্যামোনিয়াম সালফেটের সহিত গোবর অথবা খড় মিশ্রিত করিয়া শস্যের উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে। ডেনমার্কের আসকভ (Askov) কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নাইট্রোজেনের সহিত গোবর মিশ্রিত করিয়া যে পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হয় তাহা কেবল রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে উৎপন্ন শস্য অপেক্ষা অধিক। জি. এইচ. কলিংস (G. H. Collings) লিখিয়াছেন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বহু কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে দেখা গিয়াছে যে, সকল জাতীয় সবুজ সার অথবা গোবর তৃণ পাতা খড় ইত্যাদি রাসায়নিক সারের সহিত মিশ্রিত করিলে ফসল উৎপাদনে প্রভূত উপকার হয়। এই কারণে কৃষির উন্নতির নিমিত্ত রাসায়নিক সার ও জৈব

পদার্থের মিশ্রণ আবশ্যক। ফরাসী দেশের বিখ্যাত কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ভেয়ার্স হইতে (Versailles) রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের সহিত খড় মিশ্রিত করিয়া অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদিত হইয়াছে।

বিভিন্ন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রযুক্ত রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার হইতে ফসল কত ভাগ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এই বিষয়ে বহু গবেষণা হইয়াছে। ফলে দেখা গিয়াছে যে, শস্য নাইট্রোজেনের মোটামুটি শতকরা ২৫ হইতে ৬০ ভাগ ব্যবহার করিতে পারে। সারণী ২৩-এ কয়েকটি গবেষণার ফলাফল প্রদত্ত হইল।

আমেরিকার অধ্যাপক লোনিস (Lohnis) ও ফ্রেড (Fred) জমিতে সংযুক্ত নাইট্রোজেন, সুপারফস্‌ফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করিয়াছিলেন ও ৪ বৎসর অবধি এই তিন প্রকার রাসায়নিক সারের কি পরিমাণ অংশ পোষণে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

উৎপাদিত ফসল এই তিন প্রকার সারের শতকরা কত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইল—

রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার	৭·৮ হইতে ৪৬·১ ভাগ
সুপারফস্‌ফেট	১০·১ হইতে ৭৫·৬ ভাগ
পটাশ	২২·৪ হইতে ৮৫·১ ভাগ

সারণী ২৩-এ প্রদত্ত বিভিন্ন দেশের গবেষণার ফল হইতে দেখা যাইতেছে যে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার জমিতে প্রয়োগ করিলে কোনো কোনো ফসল উহার কেবল এক-তৃতীয়াংশ মাত্র গ্রহণ করে। উক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, জমিতে সোডিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ করিলে ফসল-কর্তৃক যে পরিমাণ নাইট্রোজেন গৃহীত হয় তাহা অ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা সিয়ানামাইড হইতে অধিক। ইহার কারণ সিয়ানামাইড ও অ্যামোনিয়াম সালফেট জমিতে প্রয়োগ করিলে প্রথমে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায় এবং পরে এই অ্যামোনিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া নাইট্রাইট ও নাইট্রেটের সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াতে অস্থায়ী

সারণী ২৩

শস্য	রথামস্টেড, ইংলণ্ড		হালে, জার্মানী		বার্লিন-ডালহেম		ফ্রান্স	
	অ্যামোনিয়াম সালফেট	সোডিয়াম নাইট্রেট	ক্যালসিয়াম সিয়ানামাইড	অ্যামোনিয়াম সালফেট	সোডিয়াম নাইট্রেট	অ্যামোনিয়াম সালফেট	সোডিয়াম নাইট্রেট	অ্যামোনিয়াম সালফেট
গম	৩৩	৪৫	৪৪	৪৯	৫৫	৬২	৬৭	৪১
যব	৪৮	৭৮	—	—	—	৬৫	৭৮	৪৫
ওট (জই)	৫২	৫০	৪১	৬০	৬২	—	—	—
আলু	৪৯	—	৩৩	৪১	৪৬	৬৫	৯২	৬৬
বীট	—	—	৬৮	৮০	৯২	—	—	৩৯

অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস হয়। এইজন্য অ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা ক্যালসিয়াম সিয়ানামাইড জমিতে প্রয়োগ করিলে নাইট্রোজেনের ক্ষয় সোডিয়াম নাইট্রেট অপেক্ষা বেশি।

এই কারণে অ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা সিয়ানামাইড প্রয়োগ অপেক্ষা সোডিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগে প্রায় সকল প্রকার ফসলই অধিকতর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। অধ্যাপক লোনিস ও ক্রেডের গবেষণা হইতে দেখা যায় যে ফসলের পোষণে রাসায়নিক সার হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ তুলনামূলকভাবে পটাশ বা ফস্ফেট অপেক্ষা কম। এই-সকল পরীক্ষা হইতে ইহা নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয় যে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার কৃষিতে ব্যবহার করিলে তাহার অধিকাংশই ক্ষয় হইয়া যাইতে পারে এবং ফসলের ব্যবহারে নাও আসিতে পারে।

অধিক পরিমাণে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে জমির উর্বরতা হানি ঘটে

সম্প্রতি ইউরোপ মহাদেশের বহু দেশে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও পূর্বে এক একর জমিতে ১০ হইতে ১৫ কেজির অধিক রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রযুক্ত হইত না। বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টা উৎপাদনে ৫০ হইতে ৭০ কেজি নাইট্রোজেন রাসায়নিক সার প্রতি একর জমিতে ব্যবহৃত হয়। প্যারিসের নিকটবর্তী এলাকা এবং উত্তর-ফ্রান্সে একর-প্রতি ৯০ হইতে ২০০ কেজি নাইট্রোজেন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হইতেছে। এত অধিক পরিমাণে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করিলে জমির ভূমিপ্রাণ ক্ষয় হইবার আশঙ্কা থাকে এবং ধীরে ধীরে জমির উর্বরতা হ্রাস পাইতে পারে। ইংলণ্ডের রথামস্টেডে এক একর জমিতে ৮৬ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, সোডিয়াম নাইট্রেট -রূপে প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছিল যে জমির ভূমিপ্রাণ হইতে উৎপাদিত নাইট্রেট বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে ও ইহাতে ক্রমশ জমির উর্বরতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে।

অধ্যাপক হেনড্রিক (Hendrik) স্কটল্যাণ্ডের জমিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে প্রতি একরে ১০৭ পাউণ্ড নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম সালফেট -রূপে প্রয়োগ করিলে জমির ভূমিপ্রাণ ক্ষয় হইতে থাকে। এবং জমির মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জমিতে পরীক্ষা করিয়া এই প্রকার ফলই পাওয়া গিয়াছে।

রাসেল (Russell) বলিয়াছেন যে ওবার্ন (Woburn) কৃষিকেন্দ্রে ৫০।৫৫ বৎসর-ব্যাপী পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে উদ্ভিদ জমি হইতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ গ্রহণ করে তাহা প্রতি বৎসর ক্রমশ জমি হইতে হ্রাস পায় ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও কমিতে থাকে। যে জমির এই প্রকারে অবনতি চলিতে থাকে সেই জমিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট সুপারফস্‌ফেট এবং পটাশ কৃত্রিম সাররূপে প্রয়োগ করিলেও এই অবনতি বন্ধ হয় না। অথচ যে জমিতে গোবর-মিশ্রিত খড় প্রয়োগ করা হয় সেই জমির অবনতি তো হয়ই না বরং উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। রথামস্টেডে পরীক্ষা করিয়াও এই প্রকার ফলাফল পাওয়া গিয়াছে। রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রতি বৎসর জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু খড়-সংযুক্ত গোবর প্রয়োগে উর্বরতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। রথামস্টেডে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে যখন পরীক্ষা আরম্ভ হয় তখন জমিসমূহে শতকরা ০·১২২ অংশ মোট নাইট্রোজেন ছিল। যে-সকল জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হইত সেই-সকল জমির মোট নাইট্রোজেন অল্প পরিমাণে হ্রাস হইয়া ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে শতকরা ০·১০ হইতে ০·১১ ভাগ হইয়াছিল। অথচ যে জমিতে বৎসরে ১৪ টন খড়-মিশ্রিত গোবর প্রয়োগ করা হইত তাহার মোট নাইট্রোজেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শতকরা ০·২৭৪ ভাগে উঠিয়াছিল। জমির এই অবনতির কারণ ভূমিপ্রাণের ক্ষয়। রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করিলে ভূমিপ্রাণের ধ্বংস বন্ধ হয় না, ফলে কালক্রমে জমির উর্বরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। কিন্তু চাষ করিয়া জৈব পদার্থ— যেমন গোবর খড় পাতা তৃণ ইত্যাদি জমিতে মিশ্রিত করিয়া দিলে জমির ভূমিপ্রাণ হ্রাস হওয়া তো দূরের কথা বরঞ্চ বৃদ্ধি

পায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জৈব পদার্থে যে-সকল কার্বোহাইড্রেট থাকে তাহা ধীরে ধীরে জমিতে জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি সৃষ্টি করে। এই শক্তির ব্যবহারে জমিতে যে নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত হয় এবং এই প্রকারে জমির ভূমিপ্রাণ এবং উর্বরতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। সুতরাং জৈব পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করিলে সেই-সকল বস্তুতে যে পরিমাণ যৌগিক নাইট্রোজেন, ফস্‌ফেট, পটাশ, জীবাণু এবং অন্যান্য হিতকর দ্রব্যাদি থাকে তাহা জমির সহিত মিশ্রিত হইয়া ফসলের উন্নতি করে। পরন্তু জৈব পদার্থের কার্বোহাইড্রেটের সাহায্যে বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে যৌগিক নাইট্রোজেন সৃষ্ট হইয়া জমির ভূমিপ্রাণের পরিমাণ ও উর্বরতা বর্ধিত হয়। ভূমিপ্রাণ জমিতে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে জৈব পদার্থ, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, অস্থিচূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল মাটিতে মিশ্রিত করিয়া হলকর্ষণ করা প্রয়োজন। ভূমিপ্রাণ জমিতে ধীরে ধীরে জারিত এবং পরিবর্তিত হইয়া সহজলভ্য নাইট্রোজেন যৌগ, ফস্‌ফেট, পটাশ, চুন ইত্যাদি শস্যখাদ্য ক্রমাগত সরবরাহ করিতে পারে, সেইজন্য ইহাকে জমির প্রাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। যে জমিতে ভূমিপ্রাণ হ্রাস পায় সেই জমিতে ফসলের অবনতি হয়।

যে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম সে জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করিলে ভূমিপ্রাণের পরিমাণ কমিয়া যায়, ফলে জমির জল ধরিয়া রাখিবার শক্তি কমিয়া যায় এবং ভূমির অবক্ষয় আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। উপরন্তু রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের ফলে জমি হইতে নাইট্রোজেনের অক্‌সাইডসমূহ অধিক পরিমাণে পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পরিমণ্ডল দূষিত হইতে পারে। অন্যান্য দেশে যেখানে বহুল পরিমাণে এই ধরনের সার ব্যবহার করা হয় সেখানে এই দূষণ একটি সমস্যা হইয়াছে। এ ছাড়া জমিতে যখন এই-সব সার নাইট্রেটে পরিণত হয়, তাহা জলে দ্রাব্য বলিয়া জলের সঙ্গে বাহিত হয় এবং জলাশয়ে নাইট্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়— এই নাইট্রেটের পরিমাণ প্রতি লক্ষ ভাগে ৪ ভাগের বেশি হইলে শিশুদের মিথামোগ্লোবিনেমিয়া (**Methamoglobinemia** বা **Blue baby**) নামক

মারাত্মক রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। ভারতবর্ষে কোনো কোনো জায়গায় এই রোগে আক্রান্ত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে মাতগুড় গোবর খড় ইত্যাদি জৈব পদার্থ জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিলে কেবলমাত্র প্রথম বৎসরই যে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হয় তাহা নহে, দ্বিতীয় তৃতীয় এবং পরবর্তী বৎসরেও এই-সকল সার প্রয়োগ না করিলেও ফসলের উন্নতি দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, এই-সকল জৈব পদার্থের দ্বারা বায়ুর নাইট্রোজেন যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত হইয়া জমিতে ভূমিপ্রাণ বর্ধিত করে। রথামস্টেডে যে পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সারণী ২৪

জৈব পদার্থ সাররূপে প্রয়োগ করিলে তাহার ফল

	প্রথম বৎসর	দ্বিতীয় বৎসর	তৃতীয় বৎসর
সার প্রয়োগ করা হয় নাই এমন জমি	১০০ ধরিলে	১০০ ধরিলে	১০০ ধরিলে
১৬ টন শালগম ও খড়ভোজী গোরুর গোবর (উহাতে মোট শতকরা ০·৫৭৭ নাইট্রোজেন ছিল)	১৩২	১৩১	১১২
১৬ টন খৈলভোজী গোরুর গোবর (উহাতে মোট শতকরা ০·৭১৬ নাইট্রোজেন ছিল)	১৮৩	১৩৭	১১৮

উপরি-উক্ত সারণী হইতে দেখা যাইতেছে যে, গোবর প্রয়োগ করিলে সার কয়েক বৎসর-ব্যাপী বলবৎ থাকিয়া জমিকে উর্বর রাখে। কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই দেখা গিয়াছে যে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে দ্বিতীয় বৎসরেই সারের কোনো উপকার দেখা যায় না বা অবশেষ থাকে না।

তৃণ উৎপাদনের জমিতে গোবর প্রয়োগে অধিকতর পরিমাণে তৃণ জন্মে। রথামস্টেড ও ওবার্নের পরীক্ষাকেন্দ্রে দেখা গিয়াছে যে, এই-সকল জমিতে কয়েক বৎসর গোবর সাররূপে প্রয়োগ করিয়া সার প্রয়োগ বন্ধ করিলেও গোবর-সারের অবশেষ-গুণ জমিতে থাকে। এমন-কি, উহার গুণ ৪০ বৎসর পর্যন্ত জমিতে থাকিতে দেখা যায় এবং ৪০ বৎসর পরও ঐ জমিতে অধিক পরিমাণে তৃণ জন্মে।

ডেনমার্কেও দেখা গিয়াছিল যে খড়-মিশ্রিত গোবর-সার রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার অপেক্ষা জমির স্থায়ী উপকার করে। রথামস্টেডে একটি জমিতে প্রতি একরে দুই হাজার পাউণ্ড কাটা খড়, ৮৬ পাউণ্ড যৌগিক নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম সালফেটরূপে এবং উপযুক্ত পরিমাণে পটাশ ও ফস্‌ফেট ব্যবহার করিয়া ৬১'৩ হন্দর তৃণ উৎপাদিত হইয়াছিল। অথচ জমিতে কাটা খড় প্রয়োগ না করিয়া সমপরিমাণ নাইট্রোজেন যৌগ, ফস্‌ফেট ও পটাশ প্রয়োগ করিয়া তাহাতে ৫৪'১ হন্দর তৃণ পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাসায়নিক সারের সহিত খড় মিশ্রিত করিলে জমিতে এমন-কি, তৃণও অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। দেখা গিয়াছে যে শুঁটিবর্গীয় (leguminous) বা শিমবর্গীয় ফসল উৎপাদনে গোবর বা খড় অতিশয় সহায়তা করে। এলাহাবাদের জমিতে শহরের আবর্জনার সহিত ক্ষারকীয় ধাতুমল মিশ্রিত করিয়া দিলে ডাল উৎপাদনে প্রভূত সহায়তা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, কখনো উৎপন্ন হয় নাই এইরূপ জমিতে শস্য উৎপাদন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ফসল জমি হইতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাহা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে নাইট্রোজেন জমি হইতে গ্যাসরূপে ক্ষয় হইয়া যায়।

কানাডাতে, কৃষিকার্য করা হয় নাই এইরূপ এক জমিতে প্রথমে গমের চাষ করিয়া নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া গিয়াছে—

সারণী ২৫

বৃক্ষহীন ময়দানে কৃষিকার্যে নাইট্রোজেনের ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্তি

	শতকরা হার	উপরের ৯ ইঞ্চি প্রতি একরে পাউণ্ড
অকর্ষিত ময়দানে নাইট্রোজেন	০·৩৭১	৬,৯৪০
২২ বৎসর কর্ষণ করিবার পর নাইট্রোজেন	০·২৫৪	৪,৭৫০
জমি হইতে হ্রাস		২,১৯০
শস্য হইতে প্রাপ্তি		৭০০
মোট ক্ষতি		১,৪৯০
বাৎসরিক ক্ষতি		৬৮

এই উর্বর জমিতে নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ প্রচুর পরিমাণে ছিল। জমি প্রথম কর্ষিত হইলে জমির প্রোটিন বায়ু ও জমির অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে প্রথমে অ্যামোনিয়া ও পরে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে পরিণত হয়। ইহার ফলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট উৎপন্ন হয় এবং তাহা সহজে ধ্বংস হইয়া নাইট্রোজেন গ্যাস ও জলে পরিণত হয়। এই প্রকারে জমি কর্ষণ করিলে উর্বর জমিসমূহের যৌগিক নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস উদ্ভূত হয়; ফলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমিয়া যায় ও জমির উর্বরতা হ্রাস পায়।

কানাডার যে-সকল স্থানে নূতন জমিতে কৃষিকার্য করা হইয়াছিল সেই-সকল স্থানে বৃষ্টিপাত অতি অল্প হয়। নাইট্রেট জলে দ্রবীভূত হওয়ার দরুন জমির নাইট্রোজেন ক্ষয় সহজে হইতে পারে না। উপরি-উক্ত প্রকারে প্রোটিন হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপাদনই যৌগিক নাইট্রোজেন ক্ষয়ের প্রধান কারণ।

আমাদের দেশে অনেক স্থলে ট্র্যাক্টর চালনা করিয়া জমি গভীরভাবে কর্ষণ করা হইতেছে। ইহাতে উর্বর জমির যৌগিক নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট

-রূপে পরিণত হইয়া ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। গভীর কর্ষণে জমির উর্বরতা সহজে নষ্ট হইতে পারে। জমির উর্বরতা অধিক কাল স্থায়ী করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর বহু স্থানে ভূমিকর্ষণের গভীরতা হ্রাস করা হইতেছে। বিশেষত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভূমিকর্ষণের গভীরতা অবশ্যই অল্প করিতে হইবে।

আদিম যুগের মানব কৃষিকার্যের জন্য বন জঙ্গল পরিষ্কার ও ভূমিতে হল চালনা করিয়া শস্যের বীজ বপন করিত। কিছুকাল শস্য উৎপাদন করিয়া তাহারা লক্ষ করিত যে ফসল উৎপাদনের হার ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। পরে ফসল এরূপ অল্প হইত যে সেই জমি আর ব্যবহার করা চলিত না। তখন তাহারা সেই জমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পুনরায় কৃষিকার্য আরম্ভ করিত। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাযাবরের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া কৃষিকার্য করে। এ ধরনের কৃষিকার্য ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখনো হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিকে 'ঝুম চাষ' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিস্তীর্ণ তৃণের জমি চষিয়া প্রথমে কৃষিকার্য আরম্ভ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। কিন্তু পরে এই-সকল জমি অনুর্বর হইতে আরম্ভ হইল। তখন ঔপনিবেশিকগণ সেই জমি ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে অকর্ষিত জমিতে পুনরায় চাষ আরম্ভ করিল। এই প্রকার চাষ আধুনিক যুগে আর সম্ভবপর নহে। কারণ বর্তমানে জনসংখ্যা বর্ধিত হওয়ায় পৃথিবীর বহু জমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পুরাতন জমি ত্যাগ করিয়া নূতন উর্বর জমি আর পাওয়া সম্ভব নয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পাতা, খড়, তৃণ, কচুরিপানা, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি কার্বন-যুক্ত পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির উর্বরতা বর্ধিত হয়। আগাছা, জঙ্গল ইত্যাদিও হলকর্ষণ দ্বারা জমিতে মিশ্রিত করিলে উহা জমির অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে জারিত হইতে থাকে এবং কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি উৎপাদন করে। এই শক্তির সাহায্যে বায়ুর নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের যৌগে পরিণত হয়। ইহার ফলে জমির ভূমিপ্রাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা

ছাড়া এই-সকল উদ্ভিদ বা জৈব পদার্থে প্রোটিন ফস্‌ফেট পটাশ চুন ইত্যাদি যে-সকল উদ্ভিদের পোষক থাকে তাহাও জমির উর্বরতা বর্ধনে সহায়তা করে। সুতরাং বৎসরের পর বৎসর অকর্ষিত জমিতে যদি তৃণ পাতা আগাছা ইত্যাদি জমা হইতে থাকে তাহা হইলে ঐ-সকল দ্রব্য ধীরে ধীরে জমিতে মিশিয়া যায় এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এইরূপে বনভূমি ও তৃণভূমির উর্বরতা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই শ্রেণীর জমি কর্ষণ করিলে প্রোটিন অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে পরিণত হয়। এই পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট প্রস্তুত হয় ও উহা ধ্বংস হইয়া নাইট্রোজেনের ক্ষয় হয়। এই নাইট্রোজেন-ক্ষয় জমির উর্বরতাহ্রাসের প্রধান কারণ। ফসল উৎপাদনে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। সেইজন্য পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গিয়াছে যে, অকর্ষিত বনভূমি বা তৃণভূমিতে কৃষিকার্য আরম্ভ করিলে সত্বরই উর্বরতা হ্রাস হইতে থাকে এবং যত্ন না করিলে সেই জমি অধিক কাল ফসল উৎপাদনের উপযোগী থাকে না। এমন-কি, কালক্রমে উহা মরুভূমিতেও পরিণত হয়। অনেকের মতে যত্নের অভাবে উর্বর জমি অনুর্বর হওয়াই প্রাচীন সভ্যতার অবনতির কারণ। এই-সকল জমির উর্বরতা পুনরায় বৃদ্ধি করিতে হইলে উহাতে তৃণ উৎপাদন করা উচিত। কিছুকাল এইরূপে তৃণ জন্মাইয়া তাহা চষিয়া অস্থিচূর্ণ বা খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট চূর্ণ প্রয়োগে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জমির উর্বরতা বর্ধনে তৃণের আবাদ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। অধিক পরিমাণে গোবর পাতা খড় ইত্যাদি জৈব পদার্থ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরিত্যক্ত জমিতে প্রয়োগ করিলে সেই জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভবপর হয়।

জৈব পদার্থ হইতে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের সাহায্যে ভালো সার (Compost) পাওয়া যায়

যুগযুগান্তর হইতে গাছ-গাছড়া পাতা খড় তৃণ ইত্যাদি সকল জাতীয় জৈব ও কার্বন-সংযুক্ত পদার্থ মাটিতে গর্ত করিয়া পচানো হইয়া থাকে। পরে উহা সাররূপে

কৃষকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই জাতীয় উদ্ভিদ বা জৈব পদার্থে শস্যখাদ্য থাকে। সূর্যরশ্মির সাহায্যে উদ্ভিদ বায়ুর কার্বনিক অ্যাসিডকে শক্তিপ্রদায়ক কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করে, সুতরাং গাছ-গাছড়া বা উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট থাকে। উদ্ভিদ নাইট্রোজেনের যৌগ ফস্‌ফেট, পটাশ, চুন ইত্যাদি খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে-কোনো উদ্ভিদ পচাইলে প্রথমে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে জারিত ও পরিবর্তিত হইয়া ভূমি-প্রাণে পরিণত হয়। এই ভূমিপ্রাণে সাধারণত যে পরিমাণ জৈব কার্বন থাকে তাহার এক-দশমাংশ জৈব নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। তবে আম্লিক ভূমিপ্রাণে এক-দশমাংশ হইতেও কম পরিমাণে যৌগিক নাইট্রোজেন থাকে। ক্ষারকীয় ভূমিপ্রাণে যৌগিক নাইট্রোজেন পাওয়া যায় এক-দশমাংশের কিছু অধিক। ভূমি-প্রাণের এই যৌগিক কার্বন ও নাইট্রোজেনের সহিত চুন, ফস্‌ফেট, পটাশ, সক্রিয় জীবাণু ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। সুতরাং এই সার ফসল উৎপাদনে সহায়ক।

পৃথিবীর যাবতীয় জৈব পদার্থকে এইরূপে সারে পরিণত করিতে পারিলে পৃথিবীর খাদ্যাভাব বহুল পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। জ্বালানী কাষ্ঠের অভাবে ভারতবর্ষ মিশর ও গ্রীসদেশে এখন পর্যন্ত অধিকাংশ গোবর সাররূপে জমিতে প্রয়োগ না করিয়া ইন্ধনরূপে ও উত্তাপ সৃষ্টির কার্যে ব্যবহার করা হয়। ইহা অতিশয় গর্হিত কার্য। জমির উর্বরতা বর্ধনে জৈব পদার্থসমূহ অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে। জৈব পদার্থ ব্যবহারের পদ্ধতি দুই প্রকার— ১. জমি কর্ষণ করিয়া জৈব পদার্থ মাটিতে মিশ্রিত করা, অথবা ২. উহা পচাইয়া সাররূপে জমিতে প্রয়োগ করা। সূর্যালোকের সাহায্যে উৎপন্ন গাছপালা আগাছা এবং জীবজন্তুর মলমূত্র সংরক্ষণ করিয়া জমির উর্বরতাবর্ধন অবশ্যকর্তব্য। এই কার্যসাধনে ভারতীয় কৃষক চীন বা জাপান -দেশীয় কৃষকগণ অপেক্ষা কম নিপুণ। চীন ও জাপানে কোনো প্রকার জৈব পদার্থ অপচয় হয় না। সর্বপ্রকার জৈব পদার্থ ভূমিপ্রাণে পরিবর্তিত করিয়া কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য বর্তমান কালে জমিতে

রাসায়নিক সার ব্যবহার না করিয়াও জৈব পদার্থ হইতে উদ্ভূত সারের বহুল প্রয়োগে চীন ও জাপানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃষকগণ জমিতে মলমূত্র ব্যবহারে অনিচ্ছুক। অথচ চীন ও জাপান -দেশীয় কৃষকগণের মলমূত্র ব্যবহারে অনিচ্ছুক হওয়া তো দূরের কথা বরং সেই দুই দেশের কৃষকগণ প্রকাশ্যে বলিয়া থাকেন যে পথিকগণ তাঁহাদের ক্ষেত্রে আসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাঁহারা চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গিয়াছে যে, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে যখন জৈব পদার্থ স্তূপাকারে রাখিয়া অথবা গর্তে পুঁতিয়া পচানো হয় তখনো যৌগিক নাইট্রোজেন ক্ষয় হয়। সুতরাং এই প্রকার সারপ্রস্তুতপদ্ধতি অপচয়মূলক। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জৈব পদার্থের কার্বোহাইড্রেট ধীরে ধীরে দগ্ধ ও পরিবর্তিত হয় এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়। এই পরিবর্তনের ফলে যে শক্তি উৎপাদিত হয় তাহা কোনো হিতকর কার্যে লাগে না। অথচ যখন এই-সকল জৈব পদার্থ হলকর্ষণ করিয়া জমিতে মিশ্রিত করা যায় তখন এই-সকল শক্তিপ্রদায়ক কার্বোহাইড্রেট মাটিতে অক্সিজেনের সাহায্যে ধীরে ধীরে জারিত হয় এবং শক্তি উৎপাদন করে। এই উৎপাদিত শক্তি মাটির মৌলিক নাইট্রোজেনকে যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিবর্তিত করিয়া জমির ভূমিপ্রাণ ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে। সেইজন্য আমাদের গবেষণার ফলাফল দেখিয়া চল্লিশ বৎসর যাবৎ ইহাই প্রচার করিয়া আসিতেছি যে, জৈব পদার্থসমূহ না পচাইয়া হলকর্ষণ দ্বারা জমিতে মিশ্রিত করিলে জমির ভূমিপ্রাণের পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

জৈব পদার্থ হইতে সার (Compost) প্রস্তুত করিতে বায়ুর তাপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ এই-সকল জৈব পদার্থ স্তূপাকারে রাখিয়া জলে সিক্ত করিয়া দিলে আমাদের দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সহজেই ভূমিপ্রাণ অথবা সারে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে এইরূপে সার প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। সেইজন্য শীতপ্রধান দেশে এই-সকল স্তূপে অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন

যৌগসমূহ যথা অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া ইত্যাদির সহিত ফস্‌ফেট, পটাশ ও চুন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এই-সকল রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার জীবাণু খাদ্য পায় এবং জৈব পদার্থের স্তূপ হইতে শক্তিপ্রদায়ক কার্বোহাইড্রেট খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এইরূপে শীতপ্রধান দেশে কার্বোহাইড্রেটের ধ্বংস বৃদ্ধির জন্য এবং সত্বর ভূমিপ্রাণ প্রস্তুত করিতে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সার প্রস্তুত হইলে সেই সার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা হইয়াছিল অনেক সময় তাহা সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া যায় এবং জৈব পদার্থে যে-সব নাইট্রোজেনের যৌগ ছিল তাহা হইতেও কিয়ৎ পরিমাণ যৌগিক নাইট্রোজেনের ক্ষয় হইয়াছে। দক্ষিণ-ফরাসী দেশে আঙুরের গাছ ও অব্যবহার্য আঙুরের অংশ হইতে সার প্রস্তুত করিতে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং সেখানে এইরূপ যৌগিক নাইট্রোজেন এমন-কি, আঙুরের অংশ ও গাছের প্রোটিন বা যৌগিক নাইট্রোজেনের ক্ষয় লক্ষিত হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রথামস্টেডে খড় এবং অল্প পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া সার প্রস্তুতের সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই পদ্ধতির নাম অ্যাডকো (Adco)। এই পদ্ধতিতেও প্রযুক্ত রাসায়নিক সারের নাইট্রোজেন ক্ষয় লক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে গমের খড় হইতে প্রস্তুত সার উৎপাদন করিতে যে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ হয় তাহারও হ্রাস বা সম্পূর্ণ ক্ষয় দেখা গিয়াছে। ইন্দোরে সার্ অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড সকল জাতীয় উদ্ভিদাংশ ও জৈব পদার্থের সহিত গোমূত্র ও ছাই অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া জৈব সার প্রস্তুত-প্রণালী পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষাতেও অনেক সময় মোট নাইট্রোজেন হ্রাস হইয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানের চা-বাগান সমূহে চা গাছের পাতা বা অন্যান্য অব্যবহার্য অংশ রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের সাহায্যে পচাইয়া সার প্রস্তুত করা হয়। ইহার অধিকাংশ স্থলেই মোট নাইট্রোজেনের হ্রাস ও ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জৈব সার

প্রস্তুতকরণে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রযুক্ত রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই-সকল পদ্ধতিতে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগের পরিবর্তন ঘটিয়া অস্থায়ী যৌগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সৃষ্টি হয়। এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সহজে জল ও নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিবর্তিত হইয়া বায়ুর সঙ্গে মিলাইয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে স্তূপের অভ্যন্তরে তাপ বৃদ্ধি পায় এবং আম্লিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। তাপ বৃদ্ধি ও আম্লিক পদার্থের উপস্থিতিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের ধ্বংস বৃদ্ধি পায়। এই কারণে সর্বত্রই এই প্রকার সার প্রস্তুতকরণে নাইট্রোজেনের যৌগসমূহের ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কয়েক বৎসর যাবৎ গবেষণা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদের দেশে সকল-জাতীয় উদ্ভিজ্জ ও জৈব পদার্থ অল্প পরিমাণ মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে উহা সহজে সারে পরিণত হয়। খড় পাতা ইত্যাদির সহিত এক-অষ্টমাংশ মাটি মিশ্রিত করিয়া স্তূপাকারে রাখিলে দুই-তিন মাসের মধ্যেই সকল জৈব পদার্থ সারে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমিতে শীতপ্রধান দেশের জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সহজলভ্য নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। জমির এই সহজলভ্য নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, পটাশ, চুন এবং স্তূপের জৈব পদার্থের কার্বোহাইড্রেট খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জীবাণু দ্রুতবেগে বংশ বৃদ্ধি করে এবং কার্বোহাইড্রেট জারিত ও পরিবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে আর রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। জমিতে জীবাণুর যে-সকল খাদ্য থাকে তাহা গ্রহণ করিয়া জীবাণু বর্ধিত হইতে থাকে এবং সকল জৈব পদার্থকে সারে পরিণত করে। আমাদের গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, এই পদ্ধতিতে সার বা মাটির যৌগিক নাইট্রোজেনের হ্রাস বা ক্ষয় ঘটে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোট নাইট্রোজেনের বৃদ্ধিই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো পরীক্ষাতে আমরা দেখিয়াছি যে জৈব যৌগিক নাইট্রোজেন ও মাটির যৌগিক নাইট্রোজেনের সমষ্টি অপেক্ষা সারে যৌগিক নাইট্রোজেন শতকরা ২৫ হইতে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ এই যে, এই পদ্ধতিতে কার্বোহাইড্রেটের জারণে

যে শক্তি উৎপাদিত হয় তাহার প্রভাবে বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। সূর্যের আলোকের সাহায্যে যৌগিক নাইট্রোজেন আরো বেশি উৎপাদিত হয়।

কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা দেখিয়াছি যে, কাঠের গুঁড়া, কচুরিপানা, খড়, পাতা ও গোবরের সহিত উহার এক-অষ্টমাংশ মাটি মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণ অস্থিচূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল চূর্ণ অথবা খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট চূর্ণ প্রয়োগ করিলে মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এই সকল ফস্‌ফেট প্রয়োগে জৈব পদার্থ হইতে যে সার প্রস্তুত হয় তাহাতে মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ ফস্‌ফেট ব্যবহার না করিলে যে সার পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা অধিক। এবং এই সারে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা যায়। সুতরাং আমাদের গবেষণা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যখনই জৈব পদার্থ পচাইয়া সার প্রস্তুত করা হয় তখন তাহাতে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট চূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল অথবা অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ করিলে সেই সংমিশ্রিত সারে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন আত্মীকৃত হয় এবং উহা জমির শস্য-উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করে। এইজন্য সর্বত্রই জৈব সার উৎপাদনে সুলভ ও সহজপ্রাপ্য খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট চূর্ণ, সুপারফস্‌ফেট, ক্ষারকীয় ধাতুমল চূর্ণ অথবা অস্থিচূর্ণ অত্যাবশ্যক। এই পদ্ধতিতে সহজে এবং সুলভে সারবান জৈব পদার্থ সৃষ্টি করা যায়। আমাদের গবেষণা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, এই-সকল ফস্‌ফেট অল্প পরিমাণে প্রয়োগেও উপকার হয় এবং জৈব পদার্থের শতকরা এক হইতে দুই ভাগ পর্যন্ত ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট প্রয়োগ করিলে সার প্রস্তুতিতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

সাধারণত ইউরোপে যে জৈব সার প্রস্তুত হয় তাহাতে শতকরা ০·৫ ভাগ মোট নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমরা এলাহাবাদ শহরের প্রায় ৪০০০ টন আবর্জনা লইয়া পরীক্ষা করিতেছি। টন-প্রতি আবর্জনায় ৩০ সের কুলটির ক্ষারকীয় ধাতুমল প্রয়োগ করিয়াছি। এই ধাতুমলে শতকরা ৮ ভাগ

ফস্‌ফেট আছে। আমরা দেখিয়াছি যে তুই মাসের মধ্যে যে আবর্জনার ধাতুমল দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শতকরা ১'০২ ভাগ মোট নাইট্রোজেন পাওয়া যায় এবং ফস্‌ফেট-বিহীন আবর্জনা হইতে উত্তাপ সৃষ্টি হয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি একর জমিতে এক টন রাসায়নিক সার মিশ্রণ (অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপারফস্‌ফেট এবং পটাশ) প্রয়োগ করিয়া নিম্নলিখিত হারে শস্য বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে—

সারণী ২৬

শস্যের নাম	একর-প্রতি শস্যবৃদ্ধির পরিমাণ
ভুট্টা	৯০ মণ
গম	৬৩ মণ
জই (ওট্‌স্)	১০৫ মণ
আলু	১৪০ মণ
রাঙা আলু	২১০ মণ
আপেল	৪৫০ মণ
বীন (এক রকম শিম)	৯৮ মণ
টোমাটো	১৫০ মণ
চীনা বাদাম	১৫০ মণ
সয়াবীন	৩৭ মণ
তুগ্ধ	৬০০০ মণ
তামাক	১৭ মণ

উক্ত সারণী হইতে দেখা যাইতেছে যে, গম ভুট্টা অথবা জইএর উৎপাদনবৃদ্ধি আলু, রাঙা আলু, তুগ্ধ, টোমাটো উৎপাদনের বৃদ্ধি অপেক্ষা অল্প। সেই কারণে পৃথিবীর উন্নত জাতিগণ বর্তমানে অধিকতর পরিমাণে শেষোক্ত দ্রব্যসমূহ সহজে উৎপাদন করিয়া থাকেন এবং এই-সকল খাদ্যাদি প্রচুর পরিমাণে জনসাধারণকে

সরবরাহ করা হয়। এই-সকল খাদ্য অতি পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য এবং শরীর রক্ষার্থ উপযোগী। আধুনিক যুগে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে আলুর চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রতিদিন জন-প্রতি প্রায় আধসের আলু আহার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। সেই কারণে ইউরোপে সম্প্রতি পাউরুটি আহার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে। নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে জনসাধারণ জন-প্রতি প্রতিদিন ২½ পোয়া হইতে ৩ পোয়া পর্যন্ত দুগ্ধপান করিয়া থাকেন। এইজন্য এই-সকল দেশের অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিসংখ্যান বিভাগ (Statistics Department) কিছুদিন পূর্বে নিউইয়র্ক হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে পৃথিবীর মধ্যে নরওয়ের মহিলাগণই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবতী।

ভূত্বক হইতে মাটির সৃষ্টি হয়। বৃক্ষাদি মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। মানুষ ও পশুপক্ষী সাধারণত খাদ্য গ্রহণ করে উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে।

নিম্নে ভূত্বক, লুসার্ন বৃক্ষ ও মানবদেহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল—

সারণী ২৭

ভূত্বক

ভূত্বকের উপাদান	শতকরা ভাগ	ভূত্বকের উপাদান	শতকরা ভাগ
অক্সিজেন	৪৯·২	হাইড্রোজেন	১·০
সিলিকন	২৬·০	টাইটেনিয়াম	০·৫
অ্যালুমিনিয়াম	৭·৪	কার্বন	০·৪
লৌহ	৪·২	ক্লোরিন	০·২
ক্যালসিয়াম	৩·৫	গন্ধক	০·১৫
সোডিয়াম	২·৪	ফসফরাস	০·১০
ম্যাগনেসিয়াম	২·৩৫	ফ্লোরিন	০·১০
পটাসিয়াম	২·৩৫	ম্যাঙ্গানিজ	০·১০

ভূত্বকের উপাদান	শতকরা ভাগ
নাইট্রোজেন, বেরিয়াম	
বিসমাথ	
ভ্যানাডিয়াম	
লিথিয়াম, নিকেল	
স্ট্রনসিয়াম	০·০১ হইতে ০·০৯
ক্রোমিয়াম	
জারকোনিয়াম	
ব্রোমিন	
সিরিয়াম, তামা	
বেরিলিয়াম	
আয়োডিন	
টিন	
কোবাল্ট	
থোরিয়াম	
দস্তা	০·০০১ হইতে ০·০০৯
লেড (সীসা)	
মলিবডেনাম	
রুবিডিয়াম	
ইট্রিয়াম	

ভূত্বকের উপাদান	শতকরা ভাগ
আরগন	
টাংস্টেন	
ট্যানটালাম	
সিজিয়াম	০·০০০১ হইতে ০·০০০৯
ক্যাডমিয়াম	
পারদ	
হাফনিয়াম	
ল্যানথানাম	
আর্সেনিক	
নিওডিমিয়াম	
নায়োবিয়াম	০·০০০০১ হইতে ০·০০০০৯
অ্যান্টিমনি	
রৌপ্য	
সেলিনিয়ম	
স্ক্যাণ্ডিয়াম	
থ্যুলিয়াম	
প্রেসিওডিমিয়াম	০·০০০০০১ হইতে ০·০০০০০৯
স্বর্ণ	
প্লাটিনাম	

লুসার্ন বৃক্ষ

উপাদান	শতকরা ভাগ	উপাদান	শতকরা ভাগ
জল	৭৫·০	বোরন	০·০০০৭
জৈব পদার্থ	২২·৪৫	রুবিডিয়াম	০·০০০৪৬
ভস্ম (ছাই)	২·৪৫	ম্যাঙ্গানিজ	০·০০০৩৬
অক্সিজেন	৭৭·৯	দস্তা (জিঙ্ক)	০·০০০৩৫
কার্বন	১১·৩৪	তাম্র (কপার)	০·০০০২৫
হাইড্রোজেন	৮·৭২	ফ্লোরিন	০·০০০১৫
নাইট্রোজেন	৮·২৫	মলিবডেনাম	০·০০০১
ফস্‌ফরাস	০·৭২	টাইটেনিয়াম	০·০০০০৯
ক্যালসিয়াম	০·৫৮	নিকেল	০·০০০০৫
পটাসিয়াম	০·১৭	ব্রোমিন	০·০০০০৫
গন্ধক	০·১০৪	লিথিয়াম	০·০০০০৪৬
ম্যাগনেসিয়াম	০·০৮২	ভ্যানেডিয়াম	০·০০০০১৬
ক্লোরিন	০·০৭	আয়োডিন	০·০০০০০২৫
সোডিয়াম	০·০৩১৬	আর্সেনিক	০·০০০০০১ অপেক্ষা কম
সিলিকন	০·০০৯৩	টিন	
লৌহ	০·০০২৭	লেড (সীসা)	
অ্যালুমিনিয়াম	০·০০২৫	স্ট্রনসিয়াম	
কোবাল্ট	০·০০০৫৫	বেরিয়াম	

মানবদেহ

জল	৬০·০	ভস্ম (ছাই)	৪·৩
জৈব পদার্থ	৩৫·৭	অক্সিজেন	৬২·৮১

উপাদান	শতকরা ভাগ	উপাদান	শতকরা ভাগ
কার্বন	১৯'৩৭	ব্রোমিন	০'০০০২
হাইড্রোজেন	৯'৩১	টিন	০'০০০২
নাইট্রোজেন	৫'১৪	ম্যাঙ্গানিজ	০'০০০১
ক্যালসিয়াম	১'৩৮	আয়োডিন	০'০০০১
গন্ধক	০'৬৪	অ্যালুমিনিয়াম	০'০০০০৫
ফস্‌ফরাস	০'৬৩	লেড (সীসা)	০'০০০০৫
সোডিয়াম	০'২৬	মলিবডেনাম	০'০০০০২
পটাসিয়াম	০'২২	বোরন	০'০০০০২
ক্লোরিন	০'১৮	আর্সেনিক	০'০০০০০৫
ম্যাগনেসিয়াম	০'০৪	কোবাল্ট	০'০০০০০৫
লৌহ	০'০০৫	লিথিয়াম	০'০০০০০৩
ফ্লোরিন	০'০০৪	ভ্যানেডিয়াম	০'০০০০০০২৬
সিলিকন	০'০০৪	নিকেল	০'০০০০০০২৫
দস্তা (জিঙ্ক)	০'০০২৫		
রুবিডিয়াম	০'০০০১	স্ট্রনসিয়াম	০'০০০০০১ অপেক্ষা কম
তাম্র (কপার)	০'০০০৪	বেরিয়াম	০'০০০০০১ অপেক্ষা কম

উপরি-উক্ত সারণীসমূহ হইতে দেখা যাইতেছে যে ভূত্বক, লুসার্ন বৃক্ষ ও মানব-দেহের উপাদানে অল্পাধিক লৌহ রহিয়াছে।

ক্ষারযুক্ত জমির সংশোধন

উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে ক্ষারযুক্ত জমি আছে। শীতকালে দিনের বেলা কানপুর হইতে দিল্লী যাত্রাকালে রেল রাস্তার দুই পার্শ্বে লবণের ন্যায় পদার্থ দেখা যায়। এই-সকল জমিতে তৃণ বা অন্যান্য উদ্ভিদ স্বল্পই জন্মে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে উক্ত সাদা লবণজাতীয় পদার্থে বহু পরিমাণে সোডিয়াম কার্বনেট

ও সোডিয়াম বাই-কার্বনেট এই তুই প্রকার ক্ষারকীয় দ্রব্য আছে। এই ক্ষারকীয় পদার্থ উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে হানিকর। কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যায় না এইরূপ ক্ষারকীয় জমি উত্তর-প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-প্রদেশে এই জমিকে 'উষর' বলা হয়, পাঞ্জাবে এই জমির নাম 'কাল্লার' (Kallar)। মিশর, হাঙ্গেরি, রাশিয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই জাতীয় বহু ক্ষারকীয় অনুর্বর জমি রহিয়াছে। এইজন্য প্রায় ১৫০ বৎসর যাবৎ কি কারণে জমিতে ক্ষারকীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় ও কি উপায়ে এই-সকল অনুর্বর জমি পুনরায় উর্বর জমিতে পরিণত করা যায়— এই বিষয়ে বহু গবেষণা চলিতেছে।

নেপোলিয়ন যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মিশর দেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন তখন মঁজ (Monge) ব্যারন ক্লড্ বারথোলে (Claude Berthollet) ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। নীলনদের উপকূলে ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ক্ষারকীয় পদার্থ ব্যারন বারথোলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, নীলনদে বানের জল হ্রাস পাইলে তুই উপকূল শুকাইয়া যায় এবং কিছুকাল পরে সেই উপকূলে সোডিয়াম কার্বনেট, বাই-কার্বনেট, সালফেট ইত্যাদি সংযুক্ত সাদা রঙের ক্ষারকীয় পদার্থ সৃষ্টি হয়। ব্যারন বারথোলে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, লবণজাতীয় পদার্থ খড়িমাটির উপর গাঢ়ভাবে পতিত হইয়া ঘনীভূত হইলে রাসায়নিক বিক্রিয়া হইতে পারে। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, নীলনদের জলে যে লবণ থাকে তাহা দ্রবণীয় অবস্থায় উপকূলের জমির খড়িমাটির উপর রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা সোডিয়াম কার্বনেট, ক্ষার ও দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সৃষ্টি করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক হিলগার্ড আমেরিকার ক্ষারকীয় জমির উপর প্রভূত গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষারকীয় পদার্থ সৃষ্টির উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীগণ এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে সম্মত নহেন। মনডেসির (Mondesir)

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সাধারণ মাটিতে লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখিলে এবং কঠিন পদার্থ হইতে তরল পদার্থ বা জলীয় পদার্থ পৃথক করিলে জলীয় পদার্থে খাদ্য লবণের সহিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ জমিতে যে চুন বা খড়িমাটি জাতীয় পদার্থ থাকে তাহার অল্পাংশ জলে দ্রবণীয় হইতে পারে। যদি জলে কোনো লবণ দ্রবণীয় থাকে তাহা হইলে জমি হইতে চুন বা ক্যালসিয়াম-সংযুক্ত পদার্থের নিষ্কাশন বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়াতে জমির সহজলভ্য ক্যালসিয়াম বা বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম জমি হইতে নির্গত হয়। মনডেসির লক্ষ করিয়াছিলেন যে, কিয়ৎ পরিমাণে চুন নিষ্কাশিত হইয়া গিয়াছে এইরূপ জমিতে কার্বনিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিয়া কঠিন পদার্থ হইতে তরল পদার্থ পৃথক করিলে তরল পদার্থে সোডিয়াম কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট পাওয়া যায়। রুশদেশের অধ্যাপক গেদ্রোয়া (Gedroiz), আমেরিকার অধ্যাপক কেলি (Kelley), হল্যাণ্ডের অধ্যাপক হিসিংক (Hissink), হাঙ্গেরির অধ্যাপক ডি সিগমণ্ড (De Sigmond) এই বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অতি উর্বর জমিকে ক্ষারকীয় জমিতে পরিণত করিতে হইলে উর্বর জমির উপর লবণ জল প্রয়োগ করা আবশ্যক। এইরূপে উর্বর জমির ব্যবহার্য ও বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম হ্রাস হইয়া যায় এবং জমিতে ক্যালসিয়ামের পরিবর্তে সোডিয়াম মিশ্রিত হয়। সুতরাং ক্ষারকীয় জমিতে বিনিময়যোগ্য (শস্যলভ্য) ক্যালসিয়াম হ্রাস পায়। উত্তম ও উর্বর জমিতে সাধারণত যে বিনিময়যোগ্য ধাতুসমূহ থাকে তাহার মধ্যে ক্যালসিয়াম সর্বাধিক এবং পরিমাণে শতকরা ৬৫ হইতে ৯৬ ভাগ। এইজন্য সাধারণ উর্বর জমিকে 'ক্যালসিয়াম মৃত্তিকা' ও ক্ষারকীয় জমিকে 'সোডিয়াম মৃত্তিকা' বলা হয়।

সাধারণ জমি জলে ধৌত হইলে বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম দ্রবণীয় অবস্থায় নিষ্কাশিত হইয়া যায়। তবে সেই জলে যদি লবণ থাকে তবে বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম নিষ্কাশন বৃদ্ধি পায়। এমন-কি, কেবল জল দিয়া ধৌত করিলেও ক্রমশ বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে জমি অম্লভাবাপন্ন হইতে

দেখা গিয়াছে। শীতপ্রধান দেশে এই প্রকারে অম্ল-জমি সৃষ্টি হয়। এই অম্ল-জমি পুনরায় উর্বর করিতে হইলে জমিতে চুন বা চুনাপাথর প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

চুন জমিতে প্রয়োগ করিলে বৃষ্টির জলের কার্বনিক অ্যাসিড অথবা জমির জৈব পদার্থের জারণে যে কার্বনিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয় তাহার সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জমিতে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটের সৃষ্টি হয়। এই ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট জমির কঠিন পদার্থসমূহের সহিত গভীরভাবে মিশ্রিত হইয়া জমিতে বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম সরবরাহ এবং শস্যের বৃদ্ধির জন্য যে ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয় তাহা প্রদান করে। এইরূপে পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গিয়াছে যে উর্বর জমিতে চুন বা খড়িমাটি (ক্যালসিয়াম) থাকা আবশ্যক এবং এই জাতীয় পদার্থ জমিতে হ্রাস পাইলে তাহা প্রয়োগ করিয়া হ্রাস পূরণ করা কর্তব্য। সুতরাং উর্বর জমিতে বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। এই বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়ামকে অপসারিত করিয়া সোডিয়াম তাহার স্থান অধিকার করে, ফলে জমি ক্ষারকীয় বা 'উষর' হইয়া যায়। সুতরাং এই ক্ষারকীয় জমি পুনরায় উর্বর করিতে হইলে সোডিয়ামকে অপসারিত করিবার জন্য পুনরায় ক্যালসিয়াম প্রয়োগ করিতে হয়।

উন্নত জাতিরা খনিজ জিপসাম (Calcium Sulphate, $CaSO_4$, $2H_2O$) প্রয়োগ করিয়া ক্ষারকীয় জমি উর্বর করিয়া থাকেন। জিপসাম অল্প পরিমাণে জলে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু জিপসাম সস্তা নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষারকীয় জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করিতে গন্ধকচূর্ণ প্রয়োগ করা হয়। গন্ধকচূর্ণ জমিতে ধীরে ধীরে জারিত হইয়া জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সালফিউরিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে। এই অম্ল-জমির ক্ষারকীয় সোডিয়াম কার্বনেট ও বাই-কার্বনেটের উপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কার্বনিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম সালফেটে পরিণত হয়। সোডিয়াম সালফেট ক্ষারকীয় পদার্থ নহে। এইরূপে ক্ষারকীয় জমি ধীরে ধীরে উর্বর জমিতে রূপান্তরিত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, এক একর ক্ষারকীয় জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করিতে হইলে

উহাতে ১০-১২ টন পরিমাণ জিপসাম অথবা অর্ধ টন গন্ধক প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই উপায়ে ক্ষারকীয় জমিকে কৃষিকার্যের উপযোগী করিতে তিন-চারি বৎসর সময় লাগে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষারকীয় জমির সংস্কারে সালফিউরিক অ্যাসিড, ফটকিরি, লৌহযুক্ত ফটকিরি, হীরাকষ, অ্যামোনিয়াম সালফেট পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। এই-সকল দ্রব্যের সাহায্যে জমির সোডিয়াম কার্বনেট ও বাই-কার্বনেট সোডিয়াম সালফেটে পরিণত হয় এবং তাহাতে জমির ক্ষার দূরীভূত হইয়া যায়। যেহেতু এই-সকল দ্রব্য সুলভ নহে সেই হেতু আমাদের এই দরিদ্র দেশে ক্ষারকীয় জমিকে উপরি-উক্ত প্রকারে শস্য-উৎপাদন-যোগ্য করা সহজে সম্ভবপর নহে। অবিভক্ত ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে ও রাজস্থানে খনিজ জিপসাম পাওয়া যাইত। বর্তমানে কেবল রাজস্থান হইতেই অল্প পরিমাণে খনিজ জিপসাম সংগ্রহ করা হয়। এই জিপসাম রাজস্থান হইতে সিন্ধ্রীতে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার কারখানায় প্রেরিত হইয়া থাকে। সেখানে হাবের বশ্ (Haber-Bosch) পদ্ধতিতে বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হয়। এই অ্যামোনিয়া কার্বনিক অ্যাসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া জলে ভাসমান জিপসামচূর্ণের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খড়িমাটি এবং অ্যামোনিয়াম সালফেটে পরিণত হয়। খড়িমাটি জলে দ্রবণীয় নহে অথচ অ্যামোনিয়াম সালফেট সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়। সুতরাং কঠিন পদার্থ হইতে তরল পদার্থ পৃথক করিলে অ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। এই তরল পদার্থ বাষ্পীভূত করিলে কঠিন অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হয়। এই পদ্ধতিতে বর্তমানে ভারতের সিন্ধ্রী ও পৃথিবীর অন্যান্য কারখানায় অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে জিপসাম সংগৃহীত হয় তাহা একমাত্র সিন্ধ্রীর কারখানার চাহিদাই মিটাইতে পারে। ক্ষারকীয় জমিকে কৃষির জমিতে পরিণত করিতে জিপসামের ব্যবহার এই দেশে সম্ভবপর নহে। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে আমরা বহু গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে ভারতবর্ষে ক্ষারকীয় জমিতে কিয়ৎ পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে কিন্তু ভূমিপ্রাণের পরিমাণ এইরূপ জমিতে অতি

অল্প। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাধারণ কৃষিকার্যোপযোগী জমিতে জৈব কার্বন, জৈব নাইট্রোজেন অপেক্ষা দশগুণ অধিক থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত ক্ষারকীয় জমিতে যে জৈব কার্বন আছে তাহা জৈব নাইট্রোজেনের কেবলমাত্র তিনগুণ অধিক। অর্থাৎ এই-সকল জমিতে জৈব কার্বন অথবা ভূমিপ্রাণ অতি অল্প পরিমাণেই থাকে। আমরা বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে ক্ষারজাতীয় পদার্থের সন্নিধানে কার্বোহাইড্রেট (সেলুলোজ) জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তিতে পরিণত হয় এবং এইরূপে অন্যান্য কার্বন-সংযুক্ত পদার্থের জারণের হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অথচ আম্লিক পদার্থের সান্নিধ্যে এই-সকল দ্রব্যের জারণের বেগ হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট, সেলুলোজ, লিগনিন ইত্যাদি কার্বনের যৌগিক পদার্থ ক্ষারকীয় জমিতে বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে অতি সহজে জারিত হইতে থাকে ও ইহাতে তাহাদের পরিমাণ সত্বর হ্রাস পায়। এই কারণে আমাদের দেশের ক্ষারকীয় জমিতে জৈব কার্বন-সংযুক্ত পদার্থ এবং ভূমিপ্রাণ অতি অল্প পরিমাণে থাকে। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে ভূমিপ্রাণের পরিমাণ হ্রাস হইলে জমি অনুর্বর হয়। শীতপ্রধান দেশে জমির জৈব পদার্থের জারণের বেগ আমাদের দেশ অপেক্ষা অল্প। সেইজন্য শীতপ্রধান দেশের জমিতে ভূমিপ্রাণের পরিমাণ অধিক। এমন-কি, শীতপ্রধান দেশের ক্ষারকীয় জমিতেও আমাদের দেশের ক্ষারকীয় জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভূমিপ্রাণ থাকে। সুতরাং শীতপ্রধান দেশের ক্ষারকীয় জমিকে কৃষিকার্যোপযোগী জমিতে পরিবর্তিত করিতে হইলে ক্ষারের পরিমাণ হ্রাস করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ক্ষারকীয় জমি উর্বর করিতে হইলে ক্ষারের পরিমাণ হ্রাস ও ভূমিপ্রাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এইজন্য আমরা অবিষ্কার করিয়াছি যে আমাদের দেশের ক্ষারকীয় জমি উর্বর করিতে হইলে জৈব পদার্থ (কার্বন-সংযুক্ত যৌগিক পদার্থ) প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

চল্লিশ বৎসরেরও বেশি পূর্বে বিহার ও উত্তর-প্রদেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। এই-সকল কারখানায় চিনি প্রস্তুত করিতে প্রায় দশ লক্ষ টন মাতগুড় উপজাত হইত। তখন ইহা কোনোরূপ

কার্যে ব্যবহৃত হইত না। কারখানার চতুষ্পার্শ্বে এই মাতগুড় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। ফলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হইত। মাতগুড়ে ইণ্ডোল (Indole) স্কেটোল (Skatole) ইত্যাদি থাকে বলিয়াই এই দুর্গন্ধের উৎপত্তি হয়। ইহাদের গন্ধ অতি অনিষ্টজনক। মাতগুড়ে যে অল্প পরিমাণ প্রোটিন থাকে তাহা বায়ুর অম্লজানের সহিত জারিত হইয়া দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে— নাইট্রোজেন-সংযুক্ত অ্যামাইনে পরিণত হয়। অধিকাংশ অ্যামাইন দুর্গন্ধময়। মানুষের বিষ্ঠা, পচা মাছ বা মাংস প্রভৃতি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ হইতে উদ্ভূত অ্যামাইন জাতীয় পদার্থ দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। জমিতে মিশ্রিত করিয়া দিলে এই-সকল দুর্গন্ধময় অ্যামাইন ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে পরিবর্তিত হইয়া ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এই কারণে রক্ত, মাংস, পচা মাছ, বিষ্ঠা ইত্যাদি প্রোটিন-বহুল পদার্থ ফসলের প্রভূত উন্নতি করিতে পারে। অধিকন্তু মাছের কাঁটায় বহু পরিমাণে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট থাকে এবং উহা অতি উত্তম শস্যখাদ্য। সেইজন্য যুগযুগান্তর হইতে পৃথিবীর সর্বত্রই পচা মাছ জমির উর্বরতা বর্ধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে আখের রসে চুন প্রয়োগ করিতে হয়। সুষ্ঠুভাবে চুন মিশ্রিত হইলে আখের রস পরিস্রুত হয়। জলীয় ভাগ পৃথক করিলে যে কঠিন পদার্থ নিম্নে পাওয়া যায় তাহা সাধারণত কারখানার কোনো কার্যে ব্যবহৃত হয় না। এই কঠিন পদার্থকে প্রেস কেক্ (Press cake) বা প্রেস মাড (Press mud) বলা হয়। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে এই কঠিন পদার্থে ক্যালসিয়াম, চিনি, প্রোটিন ও ফস্‌ফেট ইত্যাদি দ্রব্য থাকে। এই-সকল দ্রব্যই জমির উর্বরতা বর্ধন করে। পাঁচ টন মাতগুড় এবং পাঁচ টন প্রেস কেক্ মিশ্রিত করিয়া প্রতি একর ঊষর জমিতে প্রয়োগ করিলে অতি সহজে সেই অনুর্বর জমি কৃষিকার্যোপযোগী জমিতে পরিণত হয়। প্রথম বৃষ্টিপাত হইলে ঊষর জমিতে লাঙল চালনা করিয়া মাতগুড় ও প্রেস কেক্ প্রয়োগ করিতে হয় এবং পাঁচ-ছয় সপ্তাহ পরে বৃষ্টিপাত হইলে জমি আবার কর্ষণ করিয়া ধান্য বপন করিলে ভালো ফসল পাওয়া যায় এবং জমি স্থায়ীভাবে সংশোধিত হইয়া থাকে। আমরা

দেখিয়াছি যে জমিতে মাতগুড় প্রয়োগ করিলে অল্প পরিমাণে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, প্রোপিয়নিক অ্যাসিড ইত্যাদি আম্লিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই-সব আম্লিক পদার্থ জমির খড়িমাটির সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করিয়া সহজে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট, ক্যালসিয়াম প্রোপিয়নেট ইত্যাদি উৎপন্ন করে। এই-সকল ক্যালসিয়াম-সংযুক্ত দ্রব জমির ক্ষারকে খড়িমাটিতে পরিণত করে এবং এইরূপে ক্ষারকীয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। প্রেস কেকেও ক্যালসিয়াম থাকে এবং এই ক্যালসিয়াম— চিনি বা মাতগুড় হইতে উৎপন্ন অম্লর সাহায্যে দ্রবণীয় ক্যালসিয়ামের লবণে পরিণত হয় ও ক্ষারজাতীয় জমি সংশোধিত করে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে চিনি, মাতগুড় ইত্যাদি কার্বন-সংযুক্ত পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করিলে, তাহা আংশিক জারিত হয় এবং ইহা কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তির সৃষ্টি করে। এই শক্তির সাহায্যে বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের যৌগে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ঊষর জমিতে ভূমিপ্রাণ বৃদ্ধি পায়।

সর্বত্রই দেখা গিয়াছে যে ঊষর জমির উপর বৃষ্টিপাত হইলে বা জল সেচন করিয়া দিলে জলের অধিকাংশ ভাগই জমির উপরের দিকে থাকে, নিম্নে যাইতে পারে না। কিন্তু উর্বর জমিতে জল প্রয়োগ করিলে সত্বরই তাহা নিম্নস্তরে চলিয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে উর্বর জমিতে কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থ থাকায় তাহাতে বহু ছিদ্র থাকে। উর্বর জমির মাটির কণাসমূহ বৃহৎ ও তাহা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে থিতাইয়া নীচে পড়ে, অপর দিকে ঊষর জমির মাটির কণাসমূহ ক্ষুদ্র, জলে ভাসিতে থাকে, থিতাইয়া পড়ে না। এই ঊষর জমি ও জলের মিলনে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম-সংযুক্ত পদার্থ, আম্লিক পদার্থ অথবা মাতগুড় প্রয়োগ করিলে ঊষর জমির ক্ষুদ্র কণাগুলি মিলিয়া বৃহৎ কণায় পরিণত হয় এবং অতি সত্বরই থিতাইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম-সংযুক্ত পদার্থ প্রয়োগ করিলে ঊষর জমির বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম আয়ন দূরীভূত হয় ও ক্যালসিয়াম তাহার স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ অনুর্বর ক্ষারকীয় সোডিয়াম-মৃত্তিকা ফলপ্রদ ক্যালসিয়াম-মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। আম্লিক পদার্থ প্রয়োগে সোডিয়াম কার্বনেট

বা বাই-কার্বনেট হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষার দূরীভূত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মাতগুড় ও প্রেস কেক্ প্রয়োগ করিলে জমিতে জীবাণুর খাদ্য বর্ধিত হয়; এই প্রকারে হিতকারী জীবাণুর সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়া জমির উর্বরতাশক্তি অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই-সকল কারণে ক্ষারকীয় জমিকে কৃষির জমিতে পরিণত করিতে হইলে মাতগুড় ও প্রেস কেক্ সংমিশ্রণ করিয়া প্রয়োগ করাই প্রশস্ত উপায়। তিনমাসের মধ্যেই এই উপায়ে ক্ষারকীয় জমি সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত হইয়া কৃষিকার্যের উপযোগী জমিতে পরিণত হইতে পারে। জিপসাম অথবা গন্ধক প্রয়োগে জমির জৈব পদার্থ বা হিউমাস বৃদ্ধি পায় না এবং জমি সংশোধিত হইতে তিন-চারি বৎসর সময় লাগে। প্রতি একরে পাঁচ টন মাতগুড় ও পাঁচ টন প্রেস কেক্ প্রয়োগ করিলে সম্পূর্ণ অনুর্বর ও নিকৃষ্ট উষর ভূমি পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে কৃষির জমিতে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে।

বর্তমানে কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যবহারের নিমিত্ত গাঢ় মাতগুড় পাওয়া যাইতেছে না। তাহার কারণ মাতগুড় হইতে অ্যালকোহল প্রস্তুত করিয়া তাহা পেট্রলের সহিত মিশাইয়া মোটরগাড়িতে বা অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার করা হইতেছে।

কৃষির উন্নতির জন্য মাতগুড়ের ব্যবহার বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। উত্তর-প্রদেশ ও বিহারে জলমিশ্রিত মাতগুড় সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া কৃষকগণকে উহা জমিতে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইত। এই মাতগুড়েও জমির মোট নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায় এবং উষর জমি সংশোধিত হয়। তবে জলবহুল বলিয়া এই মাতগুড় অধিক পরিমাণে জমিতে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই মাতগুড়ে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম-যুক্ত পদার্থ ও আম্লিক পদার্থ বর্তমান থাকায় উষর ভূমি সংশোধনের সহায়তা করে।

মাতগুড় অন্য কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া আমরা উষর জমি সংশোধনে আর কোনো যৌগিক পদার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে, সকল জাতীয় খৈল উষর জমির সংশোধনে ব্যবহৃত হইতে পারে। সরিষার বা নিমের খৈল বা অন্যান্য খৈলে পাঁচ হইতে সাত শতাংশ

নাইট্রোজেন প্রোটিন-রূপে পাওয়া যায় এবং সকল প্রকার খৈলেই তৈলাক্ত বা স্নেহ -জাতীয় পদার্থ অল্পবিস্তর পরিমাণে থাকে। উষর জমিতে খৈল প্রয়োগ করিলে এই তৈলাক্ত বা স্নেহ -জাতীয় পদার্থ সহজে উষর জমির ক্ষারের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাবান-জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় ও ক্ষার ক্ষয় করে। এইরূপে খৈল প্রয়োগে ক্ষারকীয় জমি ক্ষারহীন হইয়া যায়। খৈলের নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ অধিকাংশই প্রোটিনধর্মী। উহা জমির অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রথমে অ্যামোনিয়া পরে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং জমির উর্বরতা বর্ধন করে। কোনো জমিতে প্রোটিন অথবা অ্যামোনিয়া -সংযুক্ত পদার্থ প্রয়োগ করিলে সেই জমিতে আম্লিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। সুতরাং খৈল প্রয়োগে জমিতে আম্লিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ক্ষারকীয় জমির ক্ষার হ্রাস করিতে থাকে। আমরা ভারতবর্ষের বহু উষর জমিতে চার-পাঁচ মণ খৈল প্রতি একরে ব্যবহার করিয়া ক্ষারকীয় জমি সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কারণ খৈল ব্যবহারে ক্ষারকীয় জমির ক্ষার ক্ষয় হয়, ভূমিপ্রাণের পরিমাণ ও সহজলভ্য যৌগিক নাইট্রোজেন সরবরাহ বৃদ্ধি হইয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়।

প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ সমৃদ্ধিশালী ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জ ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ হইতে খৈল ক্রয় করিতেছেন। খৈলে প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। সেইজন্য খৈল গোরুকে আহার করিতে দিলে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের অধিবাসিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গবাদি পশুকে খৈল আহার করিতে দেওয়াই দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রকৃষ্ট উপায়। সেইজন্য তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে খৈল ক্রয় করিয়া থাকেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে খৈল মহার্ঘ হইতেছে এবং ভারতীয় কৃষিতে খৈলের ব্যবহার হ্রাস পাইতেছে।

এই কারণে মাতগুড় বা খৈলের পরিবর্তে আমরা আরো সুলভ ও সহজলভ্য কার্বন-সংযুক্ত বা জৈব পদার্থ কৃষির উন্নতি ও ক্ষারযুক্ত জমি সংশোধনে ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য হইয়াছি।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, খড় জমিতে প্রয়োগ করিলে তাহা ধীরে ধীরে

জারিত হইতে থাকে এবং কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি উৎপাদিত হয়। এই শক্তির সাহায্যে মৌলিক নাইট্রোজেন যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত হইয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এইরূপে যে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের সৃষ্টি হয় তাহা জমির খড়িমাটির সহিত মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট উৎপন্ন করে। এই পদার্থ ক্ষারকীয় জমিতে সোডিয়াম কার্বনেটের সহিত মিশ্রিত হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে খড়িমাটিতে পরিণত হয় এবং উহা জমির ক্ষার হ্রাস করে। আমরা আরো দেখিয়াছি যে ক্ষারকীয় উষর জমিতে খড়ের সহিত অস্থিচুর্ণ অথবা খনিজ ফস্‌ফেটচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া হলচালনা করিলে আরো সহজে ক্ষারকীয় উষর জমি সংশোধিত হইয়া শস্য উৎপাদনে সক্ষম হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সকল জাতীয় কার্বনযুক্ত যৌগিক পদার্থের সহিত ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট মিশ্রিত করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে সেই জমিতে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। পরন্তু এই পদ্ধতিতে জমিতে যে কার্বনিক অ্যাসিডের সৃষ্টি হয় তাহা অস্থিচুর্ণ বা চুর্ণ খনিজ ফস্‌ফেটের ট্রাই ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের সহিত মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমিতে ডাই ক্যালসিয়াম ও মনো ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের সৃষ্টি করে। এই দুই ফস্‌ফেট ট্রাই ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অপেক্ষা জলে অধিক পরিমাণে দ্রবণীয়, সেইজন্য এই পদ্ধতিতে জমিতে সহজলভ্য এবং পরিবর্তনশীল ক্যালসিয়াম ও ক্ষারকীয় জমির সোডিয়াম কার্বনেটের সংমিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে যে খড়িমাটি সৃষ্টি হয় তাহা ক্ষার ক্ষয় করে। এইরূপে উষর জমি স্থায়ীভাবে সংশোধিত হইয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, কার্বনিক অ্যাসিড ট্রাই ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের উপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডাই ক্যালসিয়াম ও মনো ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের সৃষ্টি, কার্বনিক অ্যাসিডের সহিত খড়িমাটির রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট সৃষ্টি অপেক্ষা সহজে হইয়া থাকে। সুতরাং জৈব পদার্থের সহিত অস্থিচুর্ণ কিংবা খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটচুর্ণ জমিতে হলকর্ষণ দ্বারা মিশ্রিত করিয়া দিলে সাধারণ জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষারযুক্ত জমি

সংশোধিত হয়। এই উপায়ে ক্ষারযুক্ত জমির সংশোধন, খড়িমাটি ও কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রণ দ্বারা সংশোধন অপেক্ষা অনেকাংশে সহজসাধ্য ও ফলপ্রসূ।

আমরা দেখিয়াছি যে, ক্ষারযুক্ত জমিতে সবুজ সার হিসাবে শণ অথবা ধইঞ্চা ব্যবহার করিয়া অস্থিচূর্ণ, খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটচূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল চূর্ণ হলকর্ষণ দ্বারা মাটিতে মিশ্রিত করিয়া দিলে সেই জমি পাঁচ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়া যায় এবং শস্য উৎপাদন করিতে পারে। শণ ও ধইঞ্চাতে প্রোটিনের পরিমাণ খড়ে যে প্রোটিন থাকে তাহা অপেক্ষা অধিক। স্থতরাং জমিতে খড় ব্যবহার অপেক্ষা শণ বা ধইঞ্চা ব্যবহারে প্রোটিন অধিকতর বৃদ্ধি পায় ও তাহা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। পরন্তু খৈলের ন্যায় শণ বা ধইঞ্চার প্রোটিন জমিতে আম্লিক পদার্থ বৃদ্ধি করিয়া জমির ক্ষার হ্রাস করিতে পারে। এই কারণে ভারতবর্ষের সর্বত্রই ক্ষারকীয় উষর জমিতে চার-পাঁচ টন খড় অথবা দশ-বারো টন শণ বা ধইঞ্চা, এক টন খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া হলকর্ষণ করিলে সকল প্রকার ক্ষারকীয় জমি সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত হইয়া ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়। শণ ও ধইঞ্চাতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম-সংযুক্ত পদার্থ থাকে, ইহা ক্ষারকীয় জমির সংশোধনে সহায়ক। এই পদ্ধতি সহজ ও অতি স্থলভ। এইজন্য সকল দেশেই কৃষকগণ এই পদ্ধতি গ্রহণে সমর্থ হইবে।

অম্ল-জমি ও তাহার সংশোধন

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে শীতপ্রধান দেশের জমি অম্ল ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমি ক্ষারযুক্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক। বিশুদ্ধ জলকে বৈজ্ঞানিকগণ প্রশমিত (neutral) দ্রব্য বলিয়া মনে করেন। ১ কোটি ভাগ বিশুদ্ধ জলে এক ভাগ হাইড্রোজেন আয়ন (Ion) থাকে। হাইড্রোজেন আয়নের উপস্থিতিতে অম্লাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই-সকল আয়ন— পরাবিদ্যুতের আধান। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে পরিশুদ্ধ জলে OH আয়নও পাওয়া যায়। OH আয়ন অপরাবিদ্যুতের

আধান এবং ইহার জন্য ক্ষারের সৃষ্টি হয়। জলে হাইড্রোজেন আয়ন ও OH আয়নের ঘনত্ব (concentration) ১০^-৭। তাঁহারা পরিস্রুত জলের অম্লভাবের পরিমাণকে pH ৭ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন অর্থাৎ যে দ্রব্যের pH ৭ তাহা অম্লও নহে কিম্বা ক্ষারকীয়ও নহে, প্রশমিত (neutral)। যদি এক গ্রাম-অণু হাইড্রোক্লোরিক বা নাইট্রিক অ্যাসিড এক হাজার ভাগ পরিস্রুত জলে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে যে দ্রবণ (solution) পাওয়া যায় তাহার pH ৩ বলা হয়, অর্থাৎ কোনো পদার্থে অম্লভাগ বৃদ্ধি হইলে তাহার pH কমিতে থাকে।

যদি কস্টিক সোডা জলে দ্রবীভূত করা যায় তাহা হইলে ক্ষারকীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষারকীয়তার ক্রিয়াশীলতার মাপ বা পরিমাপ বৈজ্ঞানিকগণ pH মাত্রা দ্বারা নির্ধারিত করেন। বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে পরিস্রুত জলে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়নিত থাকে, তাহাকে উক্ত জলস্থিত আয়নিত OH-এর পরিমাণ দ্বারা গুণ করিলে ১০^-১৪ রাশি পাওয়া যায়। অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণে pH যখন ৩ তখন সেই দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ ১০^-৩ এবং OH আয়নের পরিমাণ ১০^-১১। কস্টিক সোডা জলে দ্রবীভূত করিলে যে ক্ষারযুক্ত দ্রবণ পাওয়া যায় তাহার OH আয়নের পরিমাণ যদি ১০^-৩ হয় তাহা হইলে সেই দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ ১০^-১১। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসারে অম্লাক্ত পদার্থের pH ৭ অপেক্ষা কম হওয়া উচিত। ৭ অপেক্ষা যে পরিমাণ কম হইবে সেই পরিমাণই অধিক অম্লাক্ত হইবে। ক্ষারযুক্ত পদার্থে pH ৭ অপেক্ষা অধিক থাকে। উত্তর-ভারতের ক্ষারযুক্ত জমির pH ৮ হইতে ১০·৩ অবধি পাওয়া যায়। এই ক্ষারযুক্ত জমিতে শণ ও ধইঞ্চা ও চুর্ণ খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট মিশ্রিত করিলে জমির ক্ষার কমিতে থাকে ও চারি-পাঁচ মাস পরে pH প্রায় ৭ অবধি নামে।

১০০ ভাগ পরিস্রুত জলে ৭ ভাগ সোডিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবীভূত করিলে সেই দ্রবণের pH ৮·২ হয়, ১০১/২ ভাগ সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ১০০ ভাগ জলে

দ্রবীভূত করিলে যে দ্রবণ পাওয়া যায়, তাহার pH ৮·৬ হইতে ৮·৭ অবধি দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর-ভারতে চাষের উত্তম জমির pH ৭·২ হইতে ৭·৬ পর্যন্ত দেখা যায়। ভারতবর্ষে উচ্চ পর্বতে অবস্থিত জমিসমূহ কখনো কখনো অল্প পরিমাণে অম্লভাবাপন্ন হয় এবং pH সাধারণত ৬ হইয়া থাকে। যদিও কোনো কোনো জায়গায় pH ৪·৫ পর্যন্ত হয়। ইংলণ্ডে সাধারণ জমি অম্লাক্ত এবং জমির pH ৫-৬ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোনো জমির pH ৫ অপেক্ষা কম হয় তখন সেই জমিতে ফসলের উৎপাদনের হার অনেক কমিয়া যায়। যে জমির pH ৪·৫ অপেক্ষা কম, সেই জমিতে শস্য উৎপাদন প্রায় খুব কঠিন। তবে বৃহৎ বৃক্ষাদি সরল-বর্গীয় বৃক্ষের বন (coniferous wood) সেই জমিতে জন্মিতে ও বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেক ফসল অল্প পরিমাণে অম্ল জমিতে উৎপাদন করা সম্ভব। ইংলণ্ডের মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে নিম্নলিখিত সারণীতে ফসলের সহিত pH-এর যে মান দেওয়া হইয়াছে, জমিতে pH তাহা অপেক্ষা কম হইলে সেই জমিতে উক্ত সাধারণ ফসল জন্মানো সম্ভবপর নহে।

সারণী ২৮

আলু	৪
জই (ওট্‌স)	৪·২
রাইঘাস	৪·৩
বাঁধাকপি	৪·৯
গম	৫·১
বীট, যব ইত্যাদি	৫·৯
সীমবর্গীয় উদ্ভিদ	
লাল ক্লোভার	৫·৫
আলসিক (Alsike) ক্লোভার	৫·৬

ইংলণ্ডে ইয়র্কশায়ার ও উরস্টরশায়ারে (Worcestershire) আম্লিক জমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই-সকল জমির pH ৩ কিম্বা তাহা অপেক্ষা কম। বিলাতের অরণ্যরক্ষণ কমিশন (Forestry Commission) বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই জমিতে পাইন ও স্প্রুস জাতীয় বৃক্ষ জন্মাইতেছেন। পৃথিবীর অনেক স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এইরূপ আম্লিক বনভূমিতে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটচূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল প্রয়োগ করিলে জমির আম্লিক ভাব হ্রাস পায় এবং উর্বরতা বর্ধনের ফলে বৃক্ষ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গবেষণা দ্বারা আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল, জমির হাইড্রোজেন আয়নকে সহজে দূরীভূত করিয়া জমির মৌলিক নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেনের যৌগে পরিণত করে এবং ফলে জমির উর্বরতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বনভূমিতে পাতা ও বৃক্ষের অন্যান্য অংশ পড়িয়া জমির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি করে। এই জৈব পদার্থ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের সাহায্যে সহজে ধীরে ধীরে জারিত হয় ও ইহাতে উৎপাদিত শক্তি নাইট্রোজেনের যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অধিক পরিমাণে জৈব কার্বন-যুক্ত পদার্থ-সমন্বিত সকল জাতীয় জমিতে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটচূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল মিশ্রিত করিলে তাহাদের উর্বরতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে যাবতীয় দ্রব্যের pH নির্ধারণ অতিশয় আবশ্যক। পৃথিবীর সকল চিকিৎসালয়ে সুস্থ অথবা অসুস্থ অবস্থায় দেহের তরল পদার্থ— যেমন রক্ত, লালা, মূত্র ইত্যাদির pH নির্ণীত হইয়া থাকে। দেখা যায় যে রক্তের pH ৭ অপেক্ষা অল্প পরিমাণে অধিক। অর্থাৎ রক্ত কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষারযুক্ত। অথচ মূত্র সাধারণত আম্লিক এবং তাহার pH ৭ অপেক্ষা কম। অনেক রোগে দেহের তরল পদার্থের pH অল্পবিস্তর হ্রাস পায়। অর্থাৎ দেহে আম্লিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। সেই কারণে অধিকাংশ রোগে, চিকিৎসকগণ ক্ষারকীয় (alkaline) ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ক্ষারকীয় ঔষধে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট এই-সকল দ্রব্যাদি থাকে, এবং উহা অতি সহজেই দেহের

আম্লিক পদার্থ ক্ষয় করে। অনেক খাদ্য— যেমন দুধ, ফল, তরকারি, ইত্যাদি— দেহে জারিত হইলে ক্ষারকীয় পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। এই ক্ষারকীয় পদার্থ, দন্ত, অস্থি ও দেহের অন্যান্য যন্ত্রের গঠনে সহায়তা করে এবং রক্তকে অল্প পরিমাণে ক্ষারকীয় করিয়া থাকে।

মাছ মাংস ডিম ভাত রুটি ইত্যাদি আহার করিলে তাহা জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড, শক্তি এবং ইহাদের সহিত কয়েকটি অম্ল সৃষ্টি হয়। অথচ ফল ও তরকারির ধ্বংসাবশেষে কেবলমাত্র ক্ষারকীয় পদার্থ থাকে। সেইজন্য মাছ মাংস ডিম রুটি ও ভাত হইতে সৃষ্ট আম্লিক পদার্থকে বিনষ্ট করিবার উপায় তরকারি অথবা ফল ভক্ষণ। সুতরাং সুসম খাদ্যে (balanced diet) ভাত রুটি ডাল মাছ ডিম ও মাংসের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে তরকারি ও ফল খাওয়া অবশ্যকর্তব্য। তরকারি ও ফল আহার না করিলে দেহে আম্লিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়া দেহের অভ্যন্তরে ক্ষত হইবার সম্ভাবনা থাকে। বহুমূত্র রোগেও দেহের অভ্যন্তরে আম্লিক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং তাহা দূরীভূত করিতে ক্ষারকীয় পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জমিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, রক্ত ইত্যাদি নাইট্রোজেন-সংযুক্ত পদার্থ সাররূপে ব্যবহার করিলে এই-সকল পদার্থ হইতে নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয় এবং জমিতে অম্লভাব আনয়ন করে। এই অম্লভাব হ্রাস করিতে ক্ষারকীয় পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। শীতপ্রধান দেশের কৃষিকার্যে খড়িমাটি অথবা চুনের ব্যবহার বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে যখন রথামস্টেডের কৃষিকেন্দ্রে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল তখন সেখানকার জমিতে শতকরা পাঁচভাগ খড়িমাটি পাওয়া যাইত। একশত বৎসর পূর্বে খড়-মিশ্রিত গোবর ও খড়িমাটির সার ব্যতীত অন্য কোনো সারের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। খড়-মিশ্রিত গোবর জমিতে প্রয়োগ করিলে, জৈব কার্বন-যুক্ত পদার্থ ধীরে ধীরে জারিত হইতে থাকে এবং যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়। ক্রমে গোবরের যৌগিক নাইট্রোজেন এবং সৌরশক্তির সাহায্যে যে যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি হয় তাহা

জমিতে পরিবর্তিত হইয়া অ্যামোনিয়া, নাইট্রাস অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। খড় এবং গোবরে যথেষ্ট পরিমাণে সোডা পটাশ চুন ম্যাগনেশিয়া ইত্যাদি ক্ষারযুক্ত পদার্থ থাকে। এই ক্ষারযুক্ত পদার্থসমূহ জমির অম্লভাব নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে নাইট্রোজেন যৌগ জমিতে প্রয়োগ করিলে যে আম্লিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহার অম্লভাব বিনষ্ট করিতে খড়িমাটি, চুন, অথবা, খড়, পাতা, গোবর ইত্যাদি ক্ষারকীয় পদার্থবহুল দ্রব্য জমিতে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

হল্যাণ্ডদেশে সমুদ্র হইতে জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং জমিকে কৃষিকার্যের উপযোগী করা হইয়াছে।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে অনেক ক্ষারযুক্ত জমি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই-সকল জমিতে ভূমিপ্রাণের পরিমাণ কম। জমিতে ভূমিপ্রাণ বহুল পরিমাণে থাকিলে সেই ভূমিপ্রাণ জমির ক্ষারকীয় পদার্থকে প্রশমিত করিতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমি তুলনামূলকভাবে তপ্ত। ফলে জমির ভূমিপ্রাণ সহজে জারিত হইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভূমিপ্রাণ হ্রাস হইলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায় এবং জমি ক্ষারযুক্ত হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। মৃত্তিকার সূক্ষ্ম কণা-সমূহ বায়ু বা জলের দ্বারা সহজে বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য জমিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করিয়া জমির ভূমিপ্রাণ বর্ধন করা অবশ্যকর্তব্য।

হল্যাণ্ড অতি জনবহুল দেশ। সেই দেশের অনেক জমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিম্নে। সুতরাং এই-সকল জমি সংরক্ষণের জন্য বাঁধ (Dyke) প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই বাঁধ (Dyke) ভাঙিয়া গেলে সমুদ্রের লবণাক্ত জল দেশের জমিতে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে উত্তম জমি হইতে বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম নিষ্কাশিত হইয়া তাহাতে বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম সংযুক্ত হয়। ফলে জমির ক্ষারকীয় হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সমুদ্রজলের প্রভাবে ইংলণ্ডের উপকূলেও ক্ষারকীয় জমির সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষে বোম্বাই এলাকায়, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনেও কোনো কোনো স্থলে লবণাক্ত সমুদ্রজলের প্রভাবে ক্ষারকীয় জমির সৃষ্টি হইয়াছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

পাইতে থাকায় হল্যাণ্ডে কৃষির জমি বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রবন্ধন করিয়া জুইডার জি (Zuider Zee) প্রথমে হ্রদে পরিণত করা হয়। এই হ্রদের নাম ইসেল লেক (Ysel Lake)। প্রথমে এই হ্রদ হইতে লবণাক্ত জল নিষ্কাশিত করা হইয়াছিল। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশের জমিতে কিয়ৎ পরিমাণ লোনাজল মিশ্রিত ছিল। লবণাক্ত জলের প্রভাবে জমি অল্প পরিমাণে ক্ষারকীয় ভাব ধারণ করে। হল্যাণ্ডের কৃষিবিজ্ঞানীগণ দেখাইয়াছেন যে, সমুদ্র হইতে উদ্ভূত জমিসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে খড়িমাটি থাকে। ডক্টর হিসিংক (Dr. Hissink) দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রকার জমিতে অল্প-বিস্তর উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে। এই উদ্ভিদ হলকর্ষণ করিয়া জমিতে মিশ্রিত করিয়া দিলে ধীরে ধীরে জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি উৎপাদন করে। এই কার্বনিক অ্যাসিড জমির চুনের সহিত মিলিত হইলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটে পরিণত হয়। এই দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট ক্ষারযুক্ত জমিকে সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত করিয়া পুনরায় উর্বর ক্যালসিয়াম মৃত্তিকায় পরিণত করে। এই প্রকারে উন্নতিশীল ওলন্দাজ জাতি সমুদ্র জয় করিয়া অনেক কৃষির জমি উদ্ধার করিয়াছেন, উর্বর কৃষিক্ষেত্র এবং উপনিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে ক্ষারকীয় জমি কৃষির জমিতে পরিবর্তিত করিতে চারি-পাঁচ বৎসর সময় লাগে। এই সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য ওলন্দাজ মৃত্তিকাবিজ্ঞানীগণ, ক্ষারকীয় জমিতে প্রথমেই খনিজ জিপসাম অথবা ক্যালসিয়াম সালফেট প্রয়োগ করিয়া সোডিয়াম মৃত্তিকাকে সারবান ক্যালসিয়াম মৃত্তিকাতে পরিণত করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে সমুদ্র হইতে জমি সংগ্রহে প্রচুর অর্থব্যয় হয়। ওলন্দাজ জাতি সমৃদ্ধিশীল ও অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদনেচ্ছুক বলিয়া তাঁহারা এই ব্যয় উপেক্ষা করিয়া দেশে কৃষির জমি বৃদ্ধি করিতেছেন। এই দেশে এক ব্যক্তি ০·৮ একর জমির ফসল হইতে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন। কেরালায় জন-প্রতি ০·৭ একর এবং পশ্চিমবঙ্গে ০·৮ একর কৃষি-জমি আছে। জীবনধারণের জন্য কি ইহা অপ্রতুল?

সমুদ্র হইতে উদ্ভূত জমিসমূহে সামুদ্রিক প্রাণী, জীবাণু ও উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ

হইতে উৎপন্ন ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, জৈব পদার্থ ও ভূমিপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে থাকে বলিয়া এই-সকল জমির ক্ষার দূরীভূত হইলে তাহা অতি উর্বর জমিতে পরিণত হয়, প্রচুর শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। অথচ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমিতে যেমন ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি দেশের সাধারণ জমি ও উষর জমিতে জৈব পদার্থ ও ভূমিপ্রাণের পরিমাণ অতি অল্প থাকায় ক্ষারকীয় পদার্থ দূরীভূত করিলেই এই-সকল জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না। এই-সকল জমি উর্বর করিতে হইলে ক্ষারকীয় পদার্থ দূরীভূত করিবার সঙ্গে সঙ্গে জৈব পদার্থ ও ক্যাল-সিয়াম ফস্‌ফেট প্রয়োগে জমির ভূমিপ্রাণ বৃদ্ধি করা কর্তব্য। বৈজ্ঞানিক ডি সিগমণ্ড (De Sigmond) হাঙ্গেরি দেশের ক্ষারযুক্ত জমি সংশোধিত করিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, এই-সকল জমিতে গোবর বা প্রেস কেক্ (Press cake) প্রয়োগ করিলে জমির ক্ষারকীয়তা হ্রাস পায়। শিম-জাতীয় উদ্ভিদের ব্যবহারও তিনি উপকারী বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু গবেষণা দ্বারা আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে এই-সকল জৈব পদার্থের সহিত অস্থিচূর্ণ, খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমলচূর্ণ যদি জমিতে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এই জাতীয় জৈব পদার্থ প্রয়োগের উপকার বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে জমিতে জৈব পদার্থের জারণে কার্বনিক অ্যাসিড যেরূপ সহজে অস্থি বা খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট হইতে ক্যালসিয়াম ডাই ও মনো ফস্‌ফেট সৃষ্টি করিতে পারে জমির খড়িমাটি হইতে ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটের সৃষ্টি সেরূপ সহজ নহে। ক্যালসিয়াম ডাই ফস্‌ফেট ও মনো ফস্‌ফেট জমিতে সহজলভ্য ফস্‌ফেটও সরবরাহ করে। ইহাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষারকীয়তা কমিয়া যায়। পৃথিবীর জৈব পদার্থের অধিকাংশ ভাগই জল। মানুষের দেহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে শিশুর দেহে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জল থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহে শতকরা ৫৮।৫৯ ভাগ জল পাওয়া যায়। দেহ হইতে জল হ্রাস পাইলে দেহের কমনীয়তা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন জীবজন্তুর দেহে জলের ভাগই অধিক। খাঁটি দুগ্ধে শতকরা ৮৮ ভাগ জল থাকে। বৃক্ষাদি এবং জীবাণু ইত্যাদিতেও

প্রচুর পরিমাণে জল রহিয়াছে। এই কারণে জৈব পদার্থের সৃষ্টি ও বর্ধনে জল-সরবরাহ অত্যাবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃষ্টির জল সহজে বাষ্প হইয়া নিষ্কাশিত হইয়া যায়। সেইজন্য আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে জলসেচন করিতে হয়, এই কারণেই এই দেশে জল সরবরাহ করিবার জন্য খালের সংখ্যা বর্ধনের চেষ্টা করা হইতেছে। শীতপ্রধান দেশে বৃষ্টি বা বরফের জল জমির সহিত মিশ্রিত হইলে ঐ জল বাষ্পাকারে সহজে নির্গত হয় না। জমির মধ্যেই উহা থাকিয়া যায়। এই কারণে শীতপ্রধান দেশের ক্ষেত্রে উত্তম ফসল উৎপাদন করিতে হইলে জমি হইতে জল নিষ্কাশন করা প্রয়োজন। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষির জমি হইতে জল নিষ্কাশন করাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। এই জল-নিষ্কাশন অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ। ধাতু বা সিমেন্টের বৃহদাকার নল ইউরোপে জমির জলনিষ্কাশনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিল্প বিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে ইংলণ্ডের ব্যবসাবাণিজ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইংলণ্ড ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ সমৃদ্ধিশালী হয়। ব্যবসায়ীগণ এই নবার্জিত ধন বহুল পরিমাণে কৃষি ও জমির উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন। কোটি কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিয়া জমি হইতে জলনিষ্কাশনের জন্য বহু নল ও পাম্প লাগানো হইয়াছিল। এই উপায়ে ইংলণ্ডের অনেক স্থানে জলাভূমি (fen) জল নিষ্কাশন করিবার পর অতিশয় উর্বর জমিতে প্রভূত পরিমাণে আলু জন্মাইয়া কৃষকগণ সমৃদ্ধিশালী হইতেছে। এই জমিতে এমন-কি, শতকরা তিন ভাগ মোট নাইট্রোজেন থাকায় ফসলের সহজলভ্য নাইট্রোজেন গ্রহণে সুবিধা হয়। এই-সকল জমি মোটেই অম্লাক্ত নহে। কারণ এই জমিতে খড়িমাটি যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। এই জমিতে জৈব কার্বন ও ভূমিপ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় জমির ধর্মের (Physical property) উন্নতি হয়। এই জমিতে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্ফেটচূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল-চূর্ণ প্রয়োগ করিলে আরো অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা যায়।

গম উৎপাদনে শুষ্ক জমির প্রয়োজন, অথচ ধান্য আর্দ্র জমিতে উৎপন্ন হয়। বাংলা ও আসাম অপেক্ষা উত্তর-ভারতে বৃষ্টিপাত কম হয়। সেইজন্য উত্তর-ভারতে

গম এবং বাংলা ও আসামে ধান্তের চাষ অধিক। ইংলণ্ড ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ জমি আর্দ্র থাকে বলিয়াই গম উৎপাদনের পূর্বে জল নিষ্কাশন করিতে হয়। এই জলনিষ্কাশন একটি প্রধান সমস্যা। এখন পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ জমি হইতে জলনিষ্কাশনের স্থায়ী ব্যবস্থা হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসিগণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসিগণ অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু জলনিষ্কাশন-পদ্ধতি এরূপ ব্যয়বহুল যে এই ধনী জাতিগণও অধিকাংশ স্থলে জমি হইতে জল নিষ্কাশন করিতে সমর্থ হন নাই। শস্য উৎপাদন করিতে হইলে জমি হইতে জলনিষ্কাশন আবশ্যক। এই কারণে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বহু জমি শস্য উৎপাদনের অনুপযোগী বলিয়া তৃণভূমিরূপে অথবা বৃক্ষাদি রোপণে ব্যবহৃত হইতেছে। অতিরিক্ত জলসেচের ফলে পাঞ্জাবে, হরিয়ানায় ও উত্তর-প্রদেশের কোনো কোনো স্থলে এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে সেখানেও জলনিষ্কাশন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

সুইডেনে জমি অধিক অথচ লোকসংখ্যা কম। সুইডেনের লোকসংখ্যা মাত্র ৭১·৩ লক্ষ। এই কারণে, যদিও সুইডেনে কেবলমাত্র শতকরা দশভাগ জমি হইতে জল নিষ্কাশিত করা হইতেছে তথাপি সেই দেশে যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা শতকরা দশ হইতে পনেরো ভাগ অতিরিক্ত খাদ্য বর্তমানে উৎপাদিত হইতেছে। সুইডেনের মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীগণ ও ইঞ্জিনিয়ারগণ ঐ দেশের জমি হইতে জল নিষ্কাশনের নানাবিধ সহজ উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য বহু গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের মতে সুইডেনের শতকরা নব্বই ভাগ জমি হইতে জল নিষ্কাশিত হইতেছে না; ইহা সুইডেনের পক্ষে ক্ষতিকর।

সূর্যের আলোক শক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়া বায়ুর জল ও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস হইতে চিনি, অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট, সেলুলোজ, লিগনিন ইত্যাদি কার্বন-সংযুক্ত জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই-সকল জৈব পদার্থ ব্যবহার করিয়া প্রাণিগণ জীবনধারণ করিবার শক্তি অর্জন করিয়া থাকে। এই-সকল শক্তিদানকারী পদার্থের সাহায্যে বৃক্ষাদি নাইট্রেট বা অ্যামোনিয়াম লবণ হইতে প্রোটিন (আমিষ) প্রস্তুত করে।

বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন যে, উদ্ভিদের উপর সূর্যালোক পতিত হইলে প্রথমে কার্বনিক অ্যাসিড হইতে চিনি ও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টির পর প্রোটিন বা নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৃক্ষাদিতে নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থের সৃষ্টি কার্বোহাইড্রেটের সহিত সংশ্লিষ্ট, কার্বোহাইড্রেট না থাকিলে প্রোটিনের সৃষ্টি সম্ভবপর নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আলোকের সাহায্যে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক খাদ্যের সৃষ্টি হয়। সূর্যের আলোক না পাইলে খাদ্য সৃষ্টি অসম্ভব।

জৈব পদার্থের সাহায্যে নাইট্রোজেন-সংযুক্ত সারের সৃষ্টি

আমরা বহু বৎসর যাবৎ গবেষণা করিয়া দেখিয়াছি যে দহনশীল সকল যৌগিক পদার্থই চূর্ণ করিয়া মাটির সহিত মিশ্রিত করিলে এই যৌগিক পদার্থ ধীরে ধীরে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জারিত হইতে থাকে এবং এইরূপে জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস এবং জল হইতে যে শক্তিযুক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহা জমিতে মিশ্রিত করিলে তাহার বিপরীত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে।

$$6CO_2 + 6H_2O + 676 \text{ K Cal} - C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$
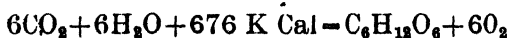
চূর্ণ অবস্থায় এই শক্তিদায়ক যৌগিক পদার্থসমূহ যেমন চিনি গুড় মৃত্তিকা লৌহভস্ম (Oxide of Iron) বা দস্তাভস্ম (Oxide of Zinc) জাতীয় কঠিন পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কোনো পাত্রে বায়ুর সংস্পর্শে রাখিলে সকল জাতীয় কার্বন-যুক্ত পদার্থ ধীরে ধীরে অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জারিত হয় এবং শক্তি নির্গত হইতে থাকে। আহারের পর নিশ্বাসের সহিত মানবদেহে যে অক্সিজেন গৃহীত হইয়া থাকে সেই অক্সিজেন দেহাভ্যন্তরে খাদ্যকে ধীরে ধীরে দহন করে। ইহার ফলে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও শক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তির সাহায্যে জীবগণ কার্য করিতে সক্ষম হয়। সকল জাতীয় মানবদেহের তাপ সুস্থ অবস্থায় ৩৭° সেলসিয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এই

তাপেই দেহের খাদ্য চারি-পাঁচ ঘণ্টায় জারিত হইতে পারে এবং শক্তিদায়ী চিনি ভাত রুটি ইত্যাদি শ্বেতসার-বহুল খাদ্য, ছানা ডাল মাংস ডিম মাছ ইত্যাদি প্রোটিন-যুক্ত খাদ্য— তৈল ঘৃত মাখন অপেক্ষা সহজে জারিত হয়। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে জমিতে তৈল ঘৃত বা মাখন উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিলে ঐ জমি যখন বায়ুর সংস্পর্শে আসে তখন তৈল ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্য অতি ধীরে ধীরে জারিত হইয়া মাটিতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও শক্তি উৎপাদন করে। এই জারণের হার প্রযুক্ত চিনি গুড় বা শ্বেতসারের জারণ অপেক্ষা কম। অর্থাৎ খাদ্য হিসাবে স্নেহ পদার্থ গুড় চিনি ইত্যাদি অপেক্ষা ধীরে ধীরে জারিত হইতে দেখা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই বিক্রিয়া দ্বারা শক্তির উৎপত্তি হয়। এই শক্তির সাহায্যে বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের যৌগে পরিবর্তিত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে তৈল বা ঘৃত মিশ্রিত করিলে নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ যে হারে বর্ধিত হয় চিনি বা গুড় মিশ্রিত করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত বেশি হারে হয়। আমরা আরো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে শীতপ্রধান দেশের জলাভূমিতে প্রাপ্ত কার্বনযুক্ত পদার্থ (Peat) ও মাদ্রাজের পালানা অঞ্চলে ও জার্মানীতে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত লিগনাইট কয়লা এবং বিটুমিনাস কয়লা চূর্ণ করিয়া জমিতে মিশাইয়া অল্প পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিলে এবং উহা বায়ুর সংস্পর্শে রাখিলে তাহা ধীরে ধীরে জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি উৎপাদিত করে। এই শক্তি হইতেও জমিতে অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেনের যৌগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে সকল-জাতীয় কয়লাতে শতকরা প্রায় এক হইতে দুই ভাগ সংযুক্ত নাইট্রোজেন থাকে। কয়লার খনি বা অন্যান্য স্থানে অব্যবহার্যভাবে যে চূর্ণ কয়লা নষ্ট হয় তাহা জমিতে মিশ্রিত করিয়া দিলে সাররূপে উহা জমির উন্নতিসাধন করিতে পারে। তাহার কারণ এই যে, কয়লাতে কিয়ৎ পরিমাণে শস্যখাদ্য থাকে। কয়লা দগ্ধ করিয়া যে ভস্ম পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক ভি. এম. গোল্ডস্মিড (V. M. Goldschmidt) ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন যে কয়লার ভস্মতে চুন, ফস্‌ফেট, পটাশ, অল্প পরিমাণ

তাম্র, লৌহ এবং উদ্ভিদের পোষক আরো বহু ধাতু থাকে। আমরাও দেখিয়াছি যে, আমাদের দেশের কয়লা-ভস্মতে ইউরোপ মহাদেশের কয়লা অপেক্ষা ফস্‌ফেটের পরিমাণ অধিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে কয়লা জমিতে মিশ্রিত করিলে জমির কার্বন-যুক্ত পদার্থ ও ভূমিপ্রাণ বৃদ্ধি পায় এবং জমিতে বিভিন্ন প্রকারের শস্যখাদ্য অল্প পরিমাণে বর্ধন করে। আমরা আরো দেখিয়াছি যে কয়লার কার্বন-যুক্ত পদার্থ গুড় চিনি তৃণ খড় গোবর প্রভৃতি কার্বন-যুক্ত পদার্থ অপেক্ষা ধীরে ধীরে জারিত হয়। সেইজন্য চূর্ণ কয়লা প্রয়োগে জমির উর্বরতা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতে পারে। এবং এই উর্বরতা অধিককাল স্থায়ী হয়। আমরা জমিতে চূর্ণ কয়লা প্রয়োগ করিয়া অধিকতর পরিমাণে গম ও ধান্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই উৎপাদনবৃদ্ধির হার তিন-চারি বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে চূর্ণ কয়লার সহিত খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট-চূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল মিশ্রিত করিয়া হলকর্ষণ করিলে জমির উর্বরতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ও বহু বৎসর স্থায়ী হয়।

জৈব পদার্থের সাহায্যে সূর্যের আলোকে যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি

আমরা বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে কার্বনযুক্ত পদার্থ প্রয়োগ করা হইয়াছে এরূপ জমিতে যদি সূর্যের আলোক পতিত হয় তাহা হইলে সেই জমিতে যে পরিমাণ যৌগিক নাইট্রোজেন বর্ধিত হয়, তাহা একই পরিমাণ যৌগিক কার্বন প্রযুক্ত হইয়াছে অথচ কাঠের তক্তা দিয়া আবৃত করিয়া রাখায় সূর্যালোক পতিত হয় নাই সেইরূপ এক একর জমিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ জমিতে কার্বন-সংযুক্ত পদার্থ প্রয়োগ করিলে সূর্যালোকের সাহায্যে অধিকতর পরিমাণে যৌগিক নাইট্রোজেন উৎপন্ন ও জমির উর্বরতা বর্ধন হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন যৌগিক নাইট্রোজেনে— অ্যামোনিয়া ইউরিয়া নাইট্রাস অ্যাসিড বা নাইট্রাইট, নাইট্রিক অ্যাসিড বা নাইট্রেট, অ্যামিনো অ্যাসিড বা প্রোটিনে পরিণত করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। চিনি, গুড়,

গোবর, কয়লা ইত্যাদি জমিতে ধীরে ধীরে জারিত হইলে যে শক্তি উৎপাদিত হয় তাহা মৌলিক নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া যৌগিক নাইট্রোজেন সৃষ্টি করে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জলের অণু শক্তি গ্রহণ করিয়া পারমাণবিক হাইড্রোজেন ও হাইড্রক্সিল র‍্যাডিক্যালে (OH radical) পরিণত হয়, এবং ইহাতে শক্তি ব্যয় হয়। ($H_2O+112\ K\ Cal=H^++OH^-$)।

সুতরাং শক্তিযুক্ত কার্বোহাইড্রেট বা অন্যান্য কার্বন-সংযুক্ত পদার্থ জমিতে মিশ্রিত হইয়া অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলে এমন-কি, অন্ধকারেও ধীরে ধীরে জারিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড ও শক্তি উৎপাদন করিতে পারে। এই উৎপাদিত শক্তি ব্যবহার করিয়া জমির জল হইতে সহজে পারমাণবিক হাইড্রোজেনের উৎপত্তি সম্ভব। এই পারমাণবিক হাইড্রোজেন জমির ও বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেনের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অ্যামোনিয়া উৎপাদন করে। অ্যামোনিয়া অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা অস্থায়ীভাবে নাইট্রাস অ্যাসিড এবং পরে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড জমির ক্যালসিয়াম বা পটাশের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহাদের নাইট্রাইট ও নাইট্রেট উৎপাদন করে। নাইট্রাইট-সমূহ সহজে নাইট্রেটে পরিণত হয়। এই কারণে জমিতে নাইট্রাইট অতি অল্প পরিমাণে থাকে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে নাইট্রেট ও শক্তিদায়ক যৌগিক পদার্থ হইতে অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন যে অ্যামিনো অ্যাসিডই প্রোটিনের ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অন্ধকারেও কার্বন-যুক্ত পদার্থের জারণ হইতে প্রাপ্ত শক্তি জমিতে মৌলিক নাইট্রোজেনকে শস্যের হিতকারী যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত করিতে পারে। কিন্তু যখন জমিতে সূর্যালোক পতিত হয় তখন জমি কিয়ৎ পরিমাণে সূর্যালোক অঙ্গীভূত করিয়া লয় এবং প্রযুক্ত জৈব পদার্থের জারণ হইতে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহার সহিত মিলিত হইয়া জমির মৌলিক নাইট্রোজেনকে অধিক পরিমাণে যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত করে। আমরা বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে কার্বন-যুক্ত পদার্থ প্রয়োগ করিলে অন্ধকারে জমিতে যে পরিমাণ

যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায় সূর্যালোকে তাহা অপেক্ষা অধিক যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি হয়। আমাদের অধিকাংশ পরীক্ষায় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে সূর্যালোকে যে যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি হয় তাহা অন্ধকারে নাইট্রোজেন বৃদ্ধির দ্বিগুণ বা তদূর্ধ্ব। সেইজন্য সূর্যের আলোক নিশ্চয়ই জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সূর্যালোকের সাহায্যে যে উদ্ভিদাদি জন্মে, তাহা ধীরে ধীরে জমির সহিত মিশ্রিত হইয়া জমিতে মিলিত হইয়া যায় ও ধীরে ধীরে জারিত হয় এবং শক্তি উৎপন্ন করে। ফলে জমিতে নাইট্রোজেনের যৌগসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে দেখা যাইতেছে যে সূর্যের আলোক উদ্ভিদের স্রষ্টা, মানুষ জীবাণু প্রভৃতির খাদ্য সরবরাহকারী জমির যৌগিক নাইট্রোজেন বর্ধনকারী এবং জমির উর্বরতাবৃদ্ধিরও কারণ। সকল জমিতেই যদি উপযুক্ত পরিমাণে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটচূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমলচূর্ণ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সূর্যালোকের সাহায্যে উদ্ভূত উদ্ভিদ তাহার কার্বনযুক্ত যৌগিক পদার্থের সাহায্যে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট ব্যবহার করিয়া জমির যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি দ্বারা স্থায়ীভাবে জমি উর্বর করিতে পারে। দেখা যাইতেছে যে সূর্যালোকের শক্তি যেমন খাদ্য সরবরাহ করে তেমনি জমির উর্বরতা দুই প্রকারে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। প্রথম সূর্যালোক পাইয়া জমিতে যে উদ্ভিদাদি জন্মে তাহা জমিতে মিশ্রিত হইলে জারিত হইয়া শক্তি উৎপন্ন করে এবং সূর্যালোক হইতে প্রাপ্ত এই শক্তি জমির যৌগিক নাইট্রোজেন বর্ধন করিয়া উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ইহা ছাড়া জমিতে সূর্যালোক পতিত হইলে কার্বন-যুক্ত পদার্থের সাহায্যে যে যৌগিক নাইট্রোজেন জমিতে বৃদ্ধি পায় তাহার পরিমাণ বর্ধিত হয়। এই দুই উপায়ে সূর্যরশ্মি জমির উর্বরতা বর্ধন করে।

জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেন অধিকাংশ প্রোটিনরূপে ও কিয়দংশ অ্যামোনিয়াম লবণরূপে অবস্থান করে। দুঃখের বিষয় এই যে, জমি কর্ষণ করিলে এই-সকল যৌগিক নাইট্রোজেন বায়ু এবং জমির অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অস্থায়ীভাবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট এবং পরে নাইট্রেটে পরিণত

হইতে থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট জমিতে অতি সহজে নাইট্রোজেন গ্যাস ও জলে পরিণত হয় ও তাহাতে যৌগিক নাইট্রোজেনের ক্ষয় হয়। অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের ধ্বংস তপ্ত জমিতে অধিক হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমির তাপ অধিক। এই কারণে আমাদের দেশের জমি কর্ষণ করিলে উর্বর জমি হইতে সহজে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের সৃষ্টি হয় ও ফলে নাইট্রোজেনের যৌগ ধ্বংস হয় এবং নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ কর্ষিত জমিতে অধিককাল থাকিতে পারে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে শীতপ্রধান দেশের জমি অম্লাক্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের ক্ষয় অম্লাক্ত জমি হইতে অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই কারণে শীত ও গ্রীষ্ম -প্রধান দেশে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের ক্ষয় প্রায় একই পরিমাণে ঘটিয়া থাকে এবং উর্বর জমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিলে যে ফসল জন্মে তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত রাসায়নিক সার হইতে গৃহীত নাইট্রোজেন অপেক্ষা অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের ধ্বংসের জন্য জমির যে পরিমাণ নাইট্রোজেন ক্ষয় হয় তাহা অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে যদিও সূর্যালোকের সাহায্যে জমিতে প্রযুক্ত কার্বন-সংযুক্ত পদার্থ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিকতর পরিমাণে নাইট্রোজেন যৌগ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় তথাপি সূর্যের তাপ ও কিরণে এই যৌগিক নাইট্রোজেনের ক্ষয়ও অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। অনেক গবেষণা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট অন্ধকারে ধীরে ধীরে ধ্বংস হইয়া নাইট্রোজেন গ্যাস ও জল উৎপাদন করে। সূর্যালোকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের ধ্বংস বৃদ্ধি পায়, সুতরাং সূর্যালোকে একদিকে জমির যৌগিক নাইট্রোজেন বর্ধিত হয় এবং অপর দিকে বিপরীত বিক্রিয়া দ্বারা তাহার ক্ষয় হইবার ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস করে। সেইজন্য সূর্যালোকে জমির উপকার ও অপকার দুইই সাধিত হয়। সূর্যালোকে সৃষ্ট প্রোটিন বা অন্যান্য নাইট্রোজেন যৌগ ধ্বংস হইবার পূর্বেই মানবজাতির তাহা শস্য-উৎপাদনে ব্যবহার করা কর্তব্য। অকর্ষিত জমি তৃণ বা অন্যান্য উদ্ভিদের আস্তরণে আবৃত রাখিলে জমির যৌগিক নাইট্রোজেনের হ্রাস হয় না বরং তাহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। সেই-

জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই জমিতে তৃণ অথবা শিমবর্গীয় উদ্ভিদ জন্মানো হয় এবং এইরূপে জমির যৌগিক নাইট্রোজেন ও উর্বরতা বৃদ্ধি পাইলে সেই জমি কর্ষণ করিয়া শস্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব। তৃণ ও শিমবর্গীয় উদ্ভিদ অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে জমিতে অধিক পরিমাণে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটচূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমলচূর্ণ প্রয়োগ করা কর্তব্য। কারণ যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি জমির অম্লক্ষার সাম্যভাবের (pH) উপর এবং ফস্‌ফেটের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। খনিজ ফস্‌ফেট পাথরচূর্ণ ও ক্ষারকীয় ধাতুমলচূর্ণ জমির অম্লভাব শোধন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ফস্‌ফেট থাকিবার ফলে যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃজন অধিক হয়। জমির ভূমিপ্রাণে নানাবিধ যৌগিক পদার্থ থাকে। তাহাদের প্রকৃতি (nature) এবং ধর্ম (properties) সম্পর্কে শতাধিক বৎসর যাবৎ বহু গবেষণা হইতেছে। দেখা গিয়াছে যে অনেক জমিতে এই ভূমিপ্রাণের রঙ কিঞ্চিৎ কালো। পিট (peat) ও কয়লাতে যেরূপ কালো রঙের পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় অনেক উর্বর জমিতেও সেইরূপ কালো পদার্থ থাকে। এই কালো রঙের পদার্থসমূহে কোলয়ডাল (colloidal) কার্বন থাকিতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি জমিতে মাতগুড় প্রয়োগ করিলে, অল্পদিন পরেই ইহাতে এক ধরনের কালো পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। চিনি বা মাতগুড়ে অল্প পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে কালো পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই কালো রঙের পদার্থে কোলয়ডাল কার্বন (colloidal carbon) দেখা যায়। তৃণ খড় ইত্যাদি কার্বন-যুক্ত জৈব পদার্থ জলে ডুবাইয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে তাহা কালো রঙ ধারণ করে এবং বহুদিন পরে পিটে (peat) পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে বহুকাল পরে পিট কয়লাতে পরিণত হইতে পারে।

ভূমিপ্রাণ কার্বন-যুক্ত পদার্থ হইতে সৃষ্ট হওয়ায় এই কার্বন-যুক্ত পদার্থসমূহ পরিবর্তিত হইয়া অল্প পরিমাণে কোলয়ডাল কার্বন (colloidal carbon)এ পরিণত হইতে পারে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, চিনি গুড় শ্বেতসার ইত্যাদি কার্বনের যৌগ জমিতে প্রয়োগ করিলে সহজেই জারিত ও পরিবর্তিত হইয়া যায়

এবং অল্প পরিমাণে জমিতে মিশ্রিত অবস্থায় থাকিয়া ভূমিপ্রাণের সৃষ্টি করে। খড় পাতা তৃণ কাগজ ইত্যাদি পদার্থে সেলুলোজের পরিমাণ অধিক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে জমিতে সেলুলোজ-বহুল যৌগিক পদার্থ প্রয়োগ করিলে তাহা জারিত ও পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সেলুলোজের জারণ ও পরিবর্তনের হার চিনি গুড় বা শ্বেতসার -বহুল দ্রব্যাদির পরিবর্তনের হার অপেক্ষা বহু কম। কাঠের গুঁড়া এবং শুষ্ক পাতাতে কিয়ৎ পরিমাণে লিগনিন (Lignin) থাকে। এই লিগনিনের রঙ বাদামী থেকে খয়েরী। ইহা গঠনে যে-কোনো কার্বোহাইড্রেট অপেক্ষা অধিক জটিল (complicated)। লিগনিন সেলুলোজ বা শ্বেতসার অপেক্ষা ধীরে ধীরে জারিত হয়। সুতরাং লিগনিন-বহুল যৌগিক পদার্থ প্রয়োগ করিলে তাহা জমিতে সহজে জারিত বা পরিবর্তিত হয় না। সেইজন্য অনেক মৃত্তিকা-বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে জমির ভূমিপ্রাণের অধিকাংশই লিগনিন-জাতীয় পদার্থ। এফ. বার্জিয়ুস (F. Bergius) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে, কয়লাতেও লিগনিন-জাতীয় পদার্থের পরিমাণ অধিক। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে জমির ভূমিপ্রাণে নাইট্রোজেন-সংযুক্ত পদার্থ থাকে এবং কয়লাতেও শতকরা এক হইতে দুইভাগ যৌগিক নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। সুতরাং কয়লা ও জমির ভূমিপ্রাণ লিগনিন ও প্রোটিনের মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে জমিতে বিশুদ্ধ চিনি, সেলুলোজ এমন-কি, ঘৃত মাখন তৈল ইত্যাদি স্নেহ-জাতীয় পদার্থ প্রয়োগ করিলে এই-সকল কার্বনযুক্ত পদার্থ ধীরে ধীরে জারিত ও পরিবর্তিত হইয়া শক্তি উৎপাদন করে এবং সেই শক্তি ব্যবহারে জমিতে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগের সৃষ্টি হয়। চিনি ব্যবহারে জীবাণু অনেক বৃদ্ধি পায়। এই-সব নাইট্রোজেন যৌগের অধিকাংশ প্রোটিনরূপে জমিতে থাকে। তাহা প্রযুক্ত কার্বোহাইড্রেট, সেলুলোজ এবং এমন-কি, স্নেহ-জাতীয় পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া জমির ভূমিপ্রাণ সৃষ্টি করে ও উর্বরতা বর্ধন করে। আমরা অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে দেখিয়াছি যে জমিতে মাতগুড় প্রয়োগ করিলে জমির নাইট্রোজেন যৌগসমূহের পরিমাণ ও উর্বরতা বৃদ্ধি হয় এবং জমিতে জীবাণুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই জমিতে ভূমিপ্রাণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং

তাহা ভালো ফসল উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সকল জাতীয় কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করিলে তাহা ধীরে ধীরে আংশিক জারিত ও পরিবর্তিত হইয়া জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অপরিবর্তিত কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থ এই-সব নাইট্রোজেনের যৌগ ও জীবাণুর সহিত সম্মিলিত হইয়া জমির ভূমিপ্রাণ ও উর্বরতা বর্ধন করে। কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থের সহিত যদি চূর্ণ খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল মিশ্রিত হয় তাহা হইলে দেখা গিয়াছে জমির ভূমিপ্রাণ ও উর্বরতা অধিক পরিমাণে বর্ধিত হয়।

দেখা গিয়াছে যে জমিতে ভূমিপ্রাণ ও খড়িমাটি অধিক পরিমাণে থাকিলে সেই জমিতে বহু জীবাণু জন্মে। এইরূপ জমিতে সময় সময় কেঁচো দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচো উর্বর জমির মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে আহার করে ও তাহার অধিকাংশ নিষ্কাশিত করিয়া দেয়। এইরূপে জমির মাটি উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া উর্বর হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বহু কৃষক কেঁচোর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া জমির উর্বরতা বর্ধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকায় কৃষির জন্য কেঁচো প্রচুর পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে গোবর জমিতে প্রয়োগ করিলে, গোবরে যে যৌগিক নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, পটাশ, চুন ও জীবাণু থাকে তাহাতে জমির উর্বরতা বর্ধিত হয়। সেইরূপে খড় তৃণ বা উদ্ভিদাংশ জমিতে প্রয়োগ করিলে তাহাতে যে শস্যখাদ্য থাকে তাহা ধীরে ধীরে উদ্ভিদের উপকার করে। এতকাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন যে কার্বোহাইড্রেট, সেলুলোজ অথবা লিগনিন-জাতীয় কার্বন-যুক্ত পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করিলে জীবাণু বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, কারণ এই-সকল যৌগিক পদার্থ হইতে সহজে শক্তি উদ্ভূত হয়। এই শক্তি ও এই-সকল যৌগিক পদার্থের কার্বন ব্যবহার করিয়া জীবাণু বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে এই কার্বন-যুক্ত জৈব পদার্থ জমির প্রাকৃতিক গুণও বর্ধন করে। অথচ আমরা বহুকাল যাবৎ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছি যে, সকল

জাতীয় কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করিলে ধীরে ধীরে জারিত হইয়া শক্তি উৎপাদন করে। এই শক্তি ব্যবহার করিয়া জমির ও বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া ও প্রোটিনে পরিবর্তিত হয়। অধিকাংশ জমিতে সূর্যালোক পতিত হইয়া থাকে, এবং এই সূর্যালোক জমির প্রোটিনের পরিমাণ বর্ধনে সহায়তা করে। সুতরাং আমাদের গবেষণা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে জমিতে প্রাকৃতিক কার্বন-যুক্ত যে-কোনো প্রকারের যৌগিক পদার্থ হলকর্ষণ দ্বারা মিশ্রিত করিয়া দিলে এই-সকল পদার্থে যে শস্যখাদ্য থাকে তাহা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়াও জমিতে অধিকতর পরিমাণে নাইট্রোজেনের যৌগ সৃষ্টি হইয়া জমির উর্বরতা অধিক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গোবর খড় তৃণ পাতা ইত্যাদি জৈব পদার্থ ব্যবহারে জমির নাইট্রোজেন-যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বৃদ্ধির কারণ দুইটি। উক্ত সকল জৈব পদার্থে প্রোটিন (নাইট্রোজেনের যৌগ) থাকে, অধিকন্তু এই-সকল যৌগিক পদার্থসমূহে যে কার্বন-যুক্ত দ্রব্য থাকে তাহা জমিতে প্রয়োগ করিলে উৎপাদিত শক্তির সাহায্যে নূতন নূতন নাইট্রোজেনের যৌগসমূহের সৃষ্টি হয়। দেখা গিয়াছে রথামস্টেড কৃষিকেন্দ্রে প্রতি বৎসর খড়-যুক্ত গোবর প্রয়োগ করিয়া জমির যৌগিক নাইট্রোজেন শতকরা ০·১২২ হইতে ০·২৭৬ অবধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই কেন্দ্রে জমিতে এক টন হিসাবে খড়-যুক্ত গোবর প্রয়োগ করিলে যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি শতকরা ০·১৩৭ হইয়াছিল। ওবার্ন (Woburn) কৃষিকেন্দ্রে এক টন খড়-যুক্ত গোবর প্রয়োগে জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি শতকরা ০·০৯ দেখা গিয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি (Missouri) কৃষিকেন্দ্রে এক টন গোবর প্রয়োগে শতকরা ০·১৩৭ নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি হয়। রথামস্টেড কৃষিকেন্দ্রের গবেষণার ফলাফল হইতে দেখা যায় যে গোবর প্রয়োগে জমির নাইট্রোজেন বৃদ্ধির হার পরীক্ষা আরম্ভের প্রথম দিকে যাহা ছিল শেষের দিকের বৃদ্ধির হার তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে জমির সংযুক্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ ছিল শতকরা ০·১১২ ভাগ। প্রথম বাইশ বৎসরের পরীক্ষাতে প্রতি বৎসর ১৪ টন গোবর প্রয়োগ করিবার পর

দেখা যায় যে জমির মোট নাইট্রোজেন শতকরা ৪৬ ভাগ বর্ধিত হইয়াছে। তাহার পর ২৮ বৎসর উক্ত হারে গোবর প্রয়োগে জমির মোট নাইট্রোজেন কেবলমাত্র শতকরা ২১ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। সেখানকার বৈজ্ঞানিকগণ এই ফলাফল দেখিয়া বলিয়াছেন যে, যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধির হারের গতি এরূপ নিম্নগতিতে হওয়ার কারণ জমিতে গোবরের নাইট্রোজেন ক্ষয় অথবা ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত না হইয়া জমিতে থাকিয়া যাওয়া। আমরা মনে করি এই মত ভ্রমাত্মক, কারণ আমরা দেখিয়াছি যে, গোবর জমিতে প্রয়োগ করিলে যে পরিমাণে যৌগিক নাইট্রোজেন জমিতে দেওয়া হয় তাহা ও কার্বন জারণের ফলে বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন হইতে যে যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি হয় তাহা মিলিয়া জমির নাইট্রোজেন-যৌগসমূহের পরিমাণ প্রদত্ত নাইট্রোজেন অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং জমিতে কার্বন-যুক্ত পদার্থ প্রয়োগে যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধির কারণ দুইটি। প্রথম, প্রযুক্ত যৌগিক নাইট্রোজেনের রক্ষণ; দ্বিতীয়, জমি অথবা বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন হইতে যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি। যদি প্রযুক্ত যৌগিক নাইট্রোজেনের রক্ষণই গোবর প্রয়োগে যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হইত তাহা হইলে এই বৃদ্ধি শেষের ২৮ বৎসরের পরীক্ষায় প্রথম ২২ বৎসরের পরীক্ষা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল; অথচ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রথম ২২ বৎসর ইহা শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পরের ২৮ বৎসরে কেবলমাত্র শতকরা ২১ ভাগ বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। জমিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করিলে প্রথম দিকে সেই জৈব পদার্থের ধ্বংস দ্রুত হয়। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তি হইতে জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জমিতে প্রযুক্ত নাইট্রোজেন এবং নূতন সৃষ্ট যৌগিক নাইট্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে পরিবর্তিত হইয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট, নাইট্রেট এবং নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হইয়া নাইট্রোজেনের যৌগদের ক্ষয় করে। সুতরাং জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি অ্যামোনিয়াম লবণ, ইউরিয়া, সিয়ানামাইড, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট অথবা রক্ত প্রয়োগে

সম্ভবপর নহে। এই-সকল নাইট্রোজেন-যৌগ জমিতে সহজেই অ্যামোনিয়াম লবণ ও নাইট্রেটে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াতে অনেক নাইট্রোজেন-যৌগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটে পরিণত হইয়া ক্ষয় হয় এবং জমিতে বৃষ্টি পড়িলে নাইট্রেট অতিশয় দ্রবণীয় বলিয়া জমির নিম্নস্তরে চলিয়া যায়। তবে এই-সকল নাইট্রোজেন-যৌগ হইতে সহজলভ্য অ্যামোনিয়াম লবণ ও নাইট্রেট পাওয়া যায় এবং এই-সকল পদার্থ প্রয়োগে অধিকাংশ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তবে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে পরিমাণ যৌগিক নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হয় তাহার অর্ধেকের বেশি ফসল গ্রহণ করিতে অসমর্থ। সুতরাং এই-সকল রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ নিশ্চয়ই ব্যয়সাধ্য। পরন্তু পৃথিবীর সর্বত্র বহু বৎসর যাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই-সকল রাসায়নিক সার জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায় না। এমন-কি, যৌগিক নাইট্রোজেনের হ্রাস অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অথচ খড়-যুক্ত গোবর প্রয়োগে ফসলের উন্নতি হয় এবং যৌগিক নাইট্রোজেন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। রথামস্টেডের বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে, সেখানকার জমির যৌগিক নাইট্রোজেন শতকরা ০·১২২ ভাগ হইতে কয়েকটি ক্ষেত্রে ০·২৭৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আমরা জমিতে কয়েক বৎসর শহরের আবর্জনা প্রয়োগ করিয়া শতকরা ০·০৪ হইতে ০·২৫ ভাগ পর্যন্ত যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই জমিতে বাদামী-খয়েরী রঙের ভূমিপ্রাণের ভাগ বর্ধিত হইয়া প্রভূত ফসল উৎপাদিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জমির উর্বরতার স্থায়ী বৃদ্ধি রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহারে হইতে পারে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে জমিতে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করিলে জমির মৌলিক নাইট্রোজেন যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত হইতে পারে না। অথচ যৌগিক কার্বন-সংযুক্ত পদার্থ, যেমন চিনি মাতগুড় পাতা কাগজ খড় তৃণ গোবর ইত্যাদি দ্রব্য জমিতে মৌলিক নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেনের যৌগ সৃষ্টি করিতে পারে এবং এই উপায়েই কেবলমাত্র জমির নাইট্রোজেন-যৌগ বৃদ্ধি পায় ও জমির

উর্বরতা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি হয়। সুতরাং সকল-জাতীয় খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট চূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় পদার্থ মিশ্রিত করিয়া হলকর্ষণ দ্বারা জমিতে মিশাইয়া দেওয়াই স্থায়ীভাবে জমির উর্বরতাবৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। এই উপায় অবলম্বিত হইলে সর্বত্রই সুলভে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে। জৈব পদার্থই জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কারণ। ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, উন্নতিশীল জাতিপুঞ্জ অধিকতর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে এখন অধিক পরিমাণে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করেন। চীন ভারত এবং অন্যান্য দরিদ্র দেশে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার ছিল না বলিলেও চলে, অথচ সকল দেশেই সূর্যালোকে শস্য উৎপাদন ও বৃক্ষাদি বর্ধিত হয়। শস্য এবং বৃক্ষ সহজলভ্য যৌগিক নাইট্রোজেন ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর অধিকাংশ শস্যাদি ও বৃক্ষ বর্ধনের জন্য জমির নাইট্রোজেন-যৌগ হইতে উৎপন্ন সহজলভ্য নাইট্রোজেন-যৌগ পাইয়া থাকে। আমাদের গবেষণা হইতে ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে বৃষ্টির জলে যে সহজলভ্য নাইট্রোজেন-যৌগ পাওয়া যায় ও জমিতে কার্বন-যুক্ত জৈব পদার্থের দহন হইতে উৎপাদিত শক্তি ও সূর্যালোকের সাহায্যে জমিতে যে যৌগিক নাইট্রোজেনের সৃষ্টি হয়— এই দুই প্রকার যৌগিক নাইট্রোজেন সকল জমির উর্বরতা রক্ষা করিয়া শস্য উৎপাদনে সহায়তা করে। জমির নাইট্রোজেন-যৌগসমূহ হইতে সহজলভ্য নাইট্রোজেন-যৌগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সহজেই পাওয়া যায়, সেইজন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা অনেক কম। ভারতবর্ষে সিন্ত্রীর কারখানায় বর্তমানে অধিকতর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হইতেছে ও অন্যান্য কারখানাতেও বিভিন্ন রাসায়নিক সার প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের গবেষণা হইতে দেখা গিয়াছে যে কার্বন-যুক্ত পদার্থ, যেমন কচুরিপানা, করাতের গুড়া, খড়, পাতা, তৃণ, গোবর, অ্যামোনিয়াম সালফেটের সহিত মিশ্রিত করিলে অ্যামোনিয়াম সালফেট হইতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের সৃষ্টি কম হয় এবং যৌগিক নাইট্রো-

জেনের ক্ষয়ও হয় কম। এই কারণে সর্বদা অ্যামোনিয়াম সালফেটের সহিত কার্বন-সংযুক্ত পদার্থ ব্যবহার করা কর্তব্য। পশ্চিমবাংলার অনেক স্থানে, উড়িষ্যাতে, মাদ্রাজে, আসামে অ্যামোনিয়াম সালফেটের সহিত সবুজ সার বা খড় মিশ্রিত করিয়া অধিক পরিমাণে ফসল পাওয়া গিয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের সহিত গোবর, সবুজ সার, খড়, আগাছা ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া ফসলের উন্নতি করা হইয়াছে। সুতরাং সকল দেশেই, বিশেষত ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, কেবলমাত্র রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার অপেক্ষা ইহা কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার বহুগুণে শ্রেয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক ও কৃষকগণের এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীগণ তাঁহাদের দেশের কৃষকদিগকে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতেছেন এবং কোনো কোনো কৃষক তাহার ক্ষেত্রে গোবর ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতেছেন। সুইডেনের উপ্‌সালা কৃষিকেন্দ্রের নিকটবর্তী একজন সমৃদ্ধিশালী কৃষক প্রায় দশ বৎসর ফসল উৎপাদনে কেবলমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতেছেন। তাহার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৃণ ও শিমবর্গীয় উদ্ভিদ (legume) জন্মানো হয়। ইহাতে জমির যৌগিক কার্বন ও যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তবে যে-সকল ক্ষেত্রে তৃণ ও শিমজাতীয় উদ্ভিদ জন্মানো হয় না সেই-সকল জমিতে গম বা অন্যান্য শস্যাদি উৎপাদনে জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া যাইবে। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে রথামস্টেড ও ওবার্ন কৃষি-কেন্দ্রে কেবলমাত্র কৃত্রিম সার ব্যবহারে জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বহুল পরিমাণে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহারে শস্য উৎপাদন নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জমি ধীরে ধীরে অনুর্বর হইয়া কৃষির অনুপযোগী হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, ক্যালসিয়াম সিয়ানামাইড, সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি অধিক পরিমাণে প্রস্তুত

করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই যে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবে সেই ধারণা ভ্রমাত্মক। এই ভ্রমাত্মক ধারণা বদ্ধমূল হইবার জন্য অনেক দেশে জমির উর্বরতা ধ্বংস হইয়াছে। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেন, জৈব কার্বন ও ভূমিপ্রাণের পরিমাণ কম, তাহার কারণ এই যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তপ্ত জমিতে সকল-জাতীয় জৈব পদার্থ অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইয়া সহজে জারিত হয়। ইহার উপকার ও অপকার দুইই আছে। উপকার এই যে, এই দ্রুত দহনের ফলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মোট নাইট্রোজেন হইতে প্রাপ্ত সহজলভ্য নাইট্রোজেনের শতকরা ভাগ শীতপ্রধান দেশের সহজলভ্য নাইট্রোজেন অপেক্ষা অনেক অধিক। এই কারণে কোনো সার ব্যবহার না করিয়া শীতপ্রধান দেশে যে-ফসল উৎপন্ন করা যায় তাহার পরিমাণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমিতে উৎপাদিত ফসল অপেক্ষা কম। পৃথিবীর দরিদ্র দেশসমূহ সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান এবং এই-সকল দেশে সারের অভাব হইলেও শস্য উৎপাদন সম্ভব। তাহার প্রধান কারণ এই যে সহজলভ্য নাইট্রোজেন এবং ফস্‌ফেট গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমিতে যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা শীতপ্রধান দেশের জমিতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফেট অপেক্ষা অধিক। অথচ ভারতবর্ষের শস্য উৎপাদনের হার অন্যান্য বহুদেশের অপেক্ষা কম। ইহার প্রধান কারণ আমাদের দেশের কৃষকগণ কোনো প্রকার সারই ব্যবহার করেন না। অথচ উন্নতিশীল জাতিগণ গোবর বা অন্যান্য জৈব পদার্থ জমিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। চীনদেশবাসিগণ কোনো জৈব পদার্থ নষ্ট করেন না। তাহারা সকল-জাতীয় জৈব পদার্থ পচাইয়া মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অথচ আমাদের দেশে অধিকাংশ গোবরই ইন্ধনরূপে জ্বালানো হয়। এমন-কি শহরে অনেক বাড়িতে এবং রাস্তায় বৃক্ষের পাতা একত্র করিয়া আবর্জনারূপে জ্বালাইয়া ফেলিতে দেখা যায়। এই কার্য অতিশয় গর্হিত। কারণ সকল-জাতীয় জৈব পদার্থ সাররূপে ব্যবহার করিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও ফসল উৎপাদন বেশি হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের উৎপাদন-পদ্ধতি সমূহ ব্যয়সাধ্য এবং সেই কারণে

রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের ব্যবসায় অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের মূল্য হ্রাস পাইতেছে না বরং বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ পেট্রোলিয়ম-জাত ন্যাপথার ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি। দরিদ্র কৃষকগণ যৌগিক নাইট্রোজেন সাররূপে ব্যবহার করিতে অসমর্থ, অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে সকল জমিতেই অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন অত্যাবশ্যক। উপযুক্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ সাররূপে ব্যবহার করিয়া এই সমস্যা সমাধান কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব হইতে পারে। সূর্যের আলোকে সৃষ্ট শক্তিদায়ক যৌগিক পদার্থ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মানব জাতি কৃষির উন্নতিকল্পে ইহার সম্যক উপকারিতা এখনো উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহা অপচয় ও ধ্বংস করিতেছে। এই অপচয় ও ধ্বংস বন্ধ করিয়া পৃথিবীর সকল-জাতীয় জৈব পদার্থ অবশ্যই কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যবহার করিতে হইবে। জৈব পদার্থ আংশিকভাবে পচাইয়া ফসল-উৎপাদনে ব্যবহার করা অথবা কৃষিক্ষেত্রে কোনো ফসল বা বৃক্ষাদি না থাকিলে সকল জৈব পদার্থে উপযুক্ত পরিমাণে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অথবা অস্থিচূর্ণ অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া হলকর্ষণ করিলে জমির নাইট্রোজেন-যৌগ ও উর্বরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই জমি অধিকতর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিবে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সকল-জাতীয় যৌগিক পদার্থে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট মিশ্রিত করিলে জমিতে যৌগিক নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দুই-তিন মাসের মধ্যে এই সংযুক্ত নাইট্রোজেন হইতে প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এবং এই সময়েই সেই জমিতে বৃক্ষ-রোপণ বা বীজবপন কর্তব্য। জৈব পদার্থ মিশ্রিত করিবার অব্যবহিত পরে বীজ-বপন করিলে সাধারণত সহজলভ্য নাইট্রোজেনের অভাবে ফসলের ক্ষতি হইতে দেখা যায়। কিন্তু দুই-তিন মাস সময় পাইলে সকল-জাতীয় যৌগিক পদার্থ আংশিক ভাবে ধ্বংস হইয়া সংযুক্ত নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে এবং তাহা হইতে দুই-তিন মাসের মধ্যেই যথেষ্ট সহজলভ্য নাইট্রোজেন সংগৃহীত হয় এবং শস্যের উন্নতি সাধিত হয়। তবে দুই-তিন মাস অপেক্ষা আরো অধিক কাল পর জমিতে

বৃক্ষরোপণ বা বীজবপন করিলে ফসল-উৎপাদনের হার কম হয়। ইহার কারণ এই যে, জৈব পদার্থের প্রয়োগ এবং বীজবপনের ব্যবধান গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুই-তিন মাস অপেক্ষা অধিক হইলে যৌগিক নাইট্রোজেন অধিকতর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটে পরিণত হইয়া ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। জৈব পদার্থ প্রয়োগের পর জমির সহজলভ্য নাইট্রোজেন বর্ধন লক্ষিত হইলেই সেই জমিতে বীজবপন অবশ্যকর্তব্য।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে অধিকাংশ শীতপ্রধান দেশে অধিকতর পরিমাণে তৃণ এবং শিমবর্গীয় উদ্ভিদ জন্মাইয়া জমির উর্বরতা বর্ধন করা হইতেছে। আধুনিক যুগে অনেকেই বলিতেছেন যে, তৃণই কৃষির উন্নতির প্রধান সোপান। আমাদের গবেষণা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে শিমবর্গীয় উদ্ভিদ না থাকিলেও কেবলমাত্র তৃণ জন্মাইয়া জমির আস্তরণরূপে ব্যবহার করিলে জমির নাইট্রোজেন-যৌগসমূহ বৃদ্ধি পায় ও সহজলভ্য ফস্‌ফেটের পরিমাণেও বৃদ্ধি দেখা যায়। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে শিমজাতীয় উদ্ভিদই জমির যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধির একমাত্র উপায় এবং কোনো কোনো স্থলে দেখা গিয়াছে যে কেবলমাত্র তৃণ জন্মাইয়া জমির যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন তাহা অ্যাজেটোব্যকটের (Azotobacter) জীবাণু দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। অথচ লায়ন (Lyon) ও বাকমান (Buckman) যুক্তরাষ্ট্রের ইথাকাতে (Ithaca) এবং হোয়াইট (White), হলবেন (Holben) ও রিচার (Richer) যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়াতে দেখাইয়াছেন যে শিমবর্গীয় উদ্ভিদাদি অথবা অ্যাজেটোব্যকটের জীবাণু ছিল না এরূপ তৃণাচ্ছাদিত জমিতেও যৌগিক নাইট্রো-জেনের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। এ যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি রাইজোবিয়া অথবা অ্যাজেটোব্যকটের জীবাণুর সাহায্যে ঘটে নাই। আমাদের গবেষণাতে আমরা দেখিয়াছি যে যখন কার্বন-যুক্ত জৈব পদার্থ জমিতে মিশ্রিত করিয়া বায়ুর অক্সিজেনের সান্নিধ্যে রাখা হয় তখন যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণে অ্যাজেটোব্যকটের জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু সূর্যালোকে যৌগিক

নাইট্রোজেন অন্ধকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ধিত হয়, কিন্তু অ্যাজেটো-ব্যাকটের জীবাণু সর্বদা সূর্যালোক অপেক্ষা অন্ধকারে অধিক সংখ্যায় বর্তমান থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে অ্যাজেটোব্যাকটের জীবাণুর বর্ধনের সহিত জমির সংযুক্ত নাইট্রোজেন বৃদ্ধির কোনো নিকট সম্বন্ধ নাই। আমরা আরো দেখিয়াছি যে, জীবাণুবিহীন জমি অথবা দস্তাভস্ম (Oxide of Zinc), লৌহভস্ম (Oxide of Iron) অথবা জারিত টাইটানিয়াম (Oxide of Titanium)-এর সহিত জৈব পদার্থ মিশ্রিত করিয়া জীবাণু-বিহীন অবস্থাতে জীবাণু-বিহীন বায়ুর সান্নিধ্যে রাখিলে যৌগিক নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় অন্ধকারে যে পরিমাণ যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি হয় আলোকে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাইট্রো-জেনের বৃদ্ধি দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সূর্যালোক-প্রভাবে উদ্ভূত কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার করিয়া শিমবর্গীয় উদ্ভিদের সাহায্যে রাইজোবিয়া (Rhizo-bia) বর্গের জীবাণু যেমন জমিতে নাইট্রোজেন-যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, অ্যাজেটোব্যাকটের বর্গের জীবাণু চিনি গুড় ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট-যুক্ত পদার্থ খাদ্য হিসাবে এবং শক্তির উৎসরূপে ব্যবহার করিয়া মৌলিক নাইট্রোজেনকে নাইট্রো-জেনের যৌগে পরিণত করিতে পারে, সেইরূপ কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থ জীবাণু-বিহীন জমিতেও ধীরে ধীরে জারিত হইয়া শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে এবং সেই শক্তির ব্যবহারে জমি বা বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। মৌলিক নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেনের যৌগ পাইতে হইলে কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থের জারণ আবশ্যক। এই দহন বা জারণ অনেক প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। রাইজোবিয়া ও অ্যাজেটোব্যাকটের জীবাণু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থের জারণে ও পরিবর্তনে সহায়তা করে। মাটির সহিত এই-সকল পদার্থ মিশ্রিত করিলে মাটির উপরিভাগের কঠিন পদার্থের তলদেশে এই কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থের সহিত মাটি বা বায়ুর অক্সিজেনের সংমিশ্রণে সহায়তা করে এবং এইরূপে কার্বন-যুক্ত পদার্থ হইতে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও শক্তি ধীরে ধীরে উৎপাদিত হইয়া যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি ঘটে,

এই প্রকারে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। উর্বরতা বৃদ্ধির ফলে জমিতে অধিকতর পরিমাণে উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব হয় এবং এই উদ্ভিদাদি কালক্রমে জমির সহিত মিশ্রিত হইয়া একই উপায়ে ক্রমে ক্রমে জমির উর্বরতা বর্ধন করে। এই প্রকারে অনুর্বর জমি বা বালুকাবহুল জমি ধীরে ধীরে উর্বর হইতে থাকে। এই উর্বরতাবৃদ্ধির মূল কারণ জৈব পদার্থ (কার্বন-যুক্ত) প্রয়োগ। সুতরাং জমির উর্বরতা বর্ধন ও ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি কার্বন-যুক্ত যৌগিক পদার্থ ও ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। সূর্যালোকে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং এই-সকল জৈব পদার্থ জমিতে ধীরে ধীরে জারিত হইয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। জমিতে উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে জৈব পদার্থের সৃষ্টি ও তাহাদের আংশিক ধ্বংসের উপর জমির উর্বরতা নির্ভর করে। কারণ জৈব পদার্থের ধ্বংস হইলে তাহার সাহায্যে যৌগিক নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি ঘটে এবং জৈব পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে পটাশ ও অল্প পরিমাণ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট সরবরাহ করে। সুতরাং এই জৈব পদার্থের সহিত চূর্ণ খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অথবা ক্ষারকীয় ধাতুমল মিশ্রিত করিলে পোষক সমূহ সহজে পাওয়া যায় এবং এই উপায়ে জমির উর্বরতা বর্ধন হয়। সূর্যালোক জীবের খাদ্য সরবরাহে এবং জমির উর্বরতা বর্ধনে সহায়ক। ইহার কারণ এই যে কার্বন-যুক্ত জৈব পদার্থ খাদ্য হিসাবে ও সার হিসাবেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

যৌগিক নাইট্রোজেনের (রাসায়নিক সারের) উৎপত্তির ইতিহাস ও অপব্যবহার

আমেরিকা ও ইউরোপে খাদ্যশস্য ইত্যাদি অধিক পরিমাণে উৎপাদনের নিমিত্ত কারখানার সার ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বিলাতের বিজ্ঞান সভার (ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অব সায়ান্সেস) সভাপতি সার্ উইলিয়াম ক্রুক্স (Crookes) বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জের গম হইতে প্রস্তুত রুটি খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইলে এবং অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট গম উৎপাদন করিতে হইলে নাইট্রোজেনের যৌগ সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা উচিত।

তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে এশিয়াবাসীরা ভাত খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকেন এবং ধান্য উৎপাদনে নাইট্রোজেন-যৌগসমূহের ব্যবহার হয় না। সুতরাং নাইট্রোজেন যৌগসমূহের অভাব হইলে গম উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে না এবং ইউরোপীয় জাতিরা জীবনসংগ্রামে অকৃতকার্য হইয়া এশিয়াবাসীদের দ্বারা পরাভূত হইবেন। তিনি হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন ১৯৩১ সাল হইতে সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য নাইট্রোজেনের যৌগসমূহের অভাব হইবে এবং প্রভূত পরিমাণে গম উৎপাদন কঠিন হইবে। সেইজন্য বৈজ্ঞানিকগণকে কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেনের যৌগ প্রস্তুত করিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ক্রুক্সের (Crookes) এই ঘোষণা ফসল-উৎপাদনের উপকারের জন্য হইয়াছিল, কিন্তু ইহা ইউরোপীয় জনসাধারণের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তার প্রধান কারণ এই যে, সে সময় ইউরোপীয় জাতিরা অন্য দেশ হইতে সহজেই খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিতেন এবং ইউরোপীয় জাতিরা যুদ্ধের রসদ সরবরাহের চেষ্টায় ছিলেন। সে সময়ে পৃথিবীতে নাইট্রোজেনের যৌগ কয়লা হইতে পাওয়া যাইত। কাঁচা কয়লা উত্তপ্ত করিলে অন্যান্য বহু দ্রব্যের সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রিয়া করিলে অ্যামোনিয়াম সালফেট হয়। এই অ্যামোনিয়াম সালফেটই নাইট্রোজেন-যৌগ হিসাবে আমেরিকা ও ইউরোপের কৃষিতে ব্যবহৃত হইত। অপর-একটি নাইট্রোজেন-যৌগের ব্যবহার বহু বৎসর যাবৎ চলিতেছে। উহার নাম 'নাইট্রেট অব সোডা'। এই পদার্থটি অনেকটা সোরার মতো। সোরাতে পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে। নাইট্রেট অব সোডাতে সোডিয়াম, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের খনিতে নাইট্রেট অব সোডা আছে। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক ও পর্যটক কাউণ্ট ফন্ হামবোলড (Count von Humboldt) প্রথম চিলির খনিতে এই নাইট্রেট অব সোডা দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের চেষ্টায় ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এই খনিজ পদার্থ ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিল এবং উহা অল্প পরিমাণে কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হইতে

থাকে। ইউরোপের বাজারে যে নাইট্রেট অব সোডা বিক্রয় হইত তাহার অধিকাংশই নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইত। সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রেট অব সোডা উত্তপ্ত করিলে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পৃথিবীর বাজারে যে পরিমাণ নাইট্রিক অ্যাসিড বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই বিস্ফোরক পদার্থ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। এই বিস্ফোরক পদার্থের বেশির ভাগই ব্যবহৃত হয় যুদ্ধে মানুষ হত্যা ও অন্যান্য ধ্বংসমূলক কার্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরেজ ও ফরাসী জাতি এই সকল শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কারণ এই-সকল বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি তাঁহারা জানিতেন না। অথচ জার্মানীতে এই শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই কারণেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রথম দুই বৎসর জার্মানরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছিল।

অধ্যাপক ওস্টওয়াল্ড এবং হাবেরের গবেষণা

সার্ উইলিয়ম্ ক্রুকসের পর উইলহেল্ম ওস্টওয়াল্ড ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে জার্মান জাতিকে বলিয়াছিলেন যে ইংরাজের সহিত জার্মানীর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এই যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে হইলে জার্মানীতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা আবশ্যক। কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে চিলির নাইট্রেট অব সোডার প্রয়োজন। ইংরাজ-দের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইলে ইংরাজের নৌ-বাহিনী জার্মান জাহাজ ডুবাইতে থাকিবে এবং চিলি হইতে নাইট্রেট অব সোডা জার্মানীতে আসিতে পারিবে না। ফলে জার্মানীতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা অসম্ভব হইবে। সুতরাং জার্মান বৈজ্ঞানিকগণের চিলির নাইট্রেট অব সোডার উপর নির্ভর না করিয়া জার্মানীতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করণে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। অধ্যাপক ওস্টওয়াল্ড নিজে তাঁহার জামাতা ডঃ ব্রাওয়ারের (Brauer) সাহায্যে কয়লা হইতে প্রস্তুত অ্যামোনিয়া ব্যবহার করিয়া জার্মানীতে প্রথম নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অ্যামোনিয়া উত্তপ্ত প্লাটিনাম ধাতুর সংস্পর্শে বাতাসের

সহিত মিশ্রিত করিলে সহজে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়।

অধ্যাপক ওস্টওয়াল্ড তাঁহার আবিষ্কারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন যে এইবার জার্মানী ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবে ও তাহাদিগকে জব্দ করিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণালী স্থায়ী হইল না। প্লাটিনাম ধাতু স্বর্ণ হইতেও মূল্যবান। কয়লা হইতে যে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায় সেই অ্যামোনিয়াতে গন্ধক ও কার্বনের বিভিন্ন যৌগ মিশ্রিত থাকে এবং এই পদার্থগুলি উত্তপ্ত প্লাটিনাম ধাতুর ক্রিয়াশীলতা নষ্ট করিয়া ফেলে। অধ্যাপক ওস্টওয়াল্ড অতিশয় দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে তিনি জার্মানীর উপকার করিতে পারিলেন না। ওস্টওয়াল্ড খুব বড়ো অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার অনেক কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত গবেষণা করিতেন। অধ্যাপক ওস্টওয়াল্ড তাঁহার ছাত্রগণকে জার্মানীতে বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। তাঁহার ইহুদি ছাত্র ফ্রিট্স হাবের (Fritz Haber) এই কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আট-নয় বৎসর কঠোর পরিশ্রমে হাবের তাঁহার ছাত্রগণের সাহায্যে এবং এক বিখ্যাত জার্মান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের (Badische Anilin und Soda Fabrik) অর্থসাহায্যে বায়ুর নাইট্রোজেন ও জলের হাইড্রোজেন হইতে সর্বপ্রথম ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করেন।

ইউরোপের এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার হয়তো মানুষের হিত অপেক্ষা অহিতেই বেশি ব্যবহৃত হইয়াছে। কূটনীতি গোয়েন্দাগিরি ইত্যাদি ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভূতভাবে চলিয়া থাকে, এই নীতি ত্যাগ না করিলে ইউ-রোপের প্রকৃত শান্তি আসিতে পারে না। ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে ইউরোপের কূটনীতি ও যুদ্ধ-লালসা গ্রহণ করা উচিত নহে। ইংলণ্ডে বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা পঁচিশ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় হয়। অথচ অতি গরিব দেশ এই ভারতবর্ষ। এখানে বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা চল্লিশ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় হইতেছে। পাকিস্তানে জাতীয় আয়ের অধিকাংশই সামরিক

কার্যে খরচ হইতেছে।

পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন। বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক এ. জে. টয়নবি (A. J. Toynbee) বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রস্থল তিব্বত হইবার সম্ভাবনা।

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইউরোপের লোকেরা বলিতেন, Nothing succeeds like success— সাফল্যের ন্যায় সফল আর কিছুই হয় না।

অর্থাৎ যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থ উপার্জন করো— উহার জন্য চেষ্টিত থাকো। কিন্তু সম্প্রতি পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ ও পৃথিবীর ২১টি বড়ো বড়ো মানবসভ্যতার সমালোচনা করিয়া টয়নবি বলেন যে "Nothing fails like worldly success"— বৈষয়িক সাফল্যের ন্যায় অসফলতা আর নাই।

সকল জাতিই এখন পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা -সংঘটিত যুদ্ধ ত্যাগ করিবার কথা বলিতেছেন। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধ যদি বর্জনীয় হয় তাহা হইলে অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে সংঘটিত যুদ্ধও নিশ্চয়ই সমভাবে নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। এই সহজবোধ্য ব্যাপার মানবজাতির বোধগম্য হওয়া উচিত, তাহা না হইলে তাহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই সমস্যা সমাধানে ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের পৃথিবীর পথপ্রদর্শক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অধিক লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিই মানবের কঠিন সমস্যা

পৃথিবীর সর্বত্রই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সন্তানসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি না করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও এই ভাব আসিয়াছে। এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস পাইতেছে। ইহা এশিয়াবাসীর সৌভাগ্যের বিষয় ও উন্নতির কারণ হইবে।

নিম্নলিখিত সারণী (সারণী ২৯ এবং ৩০) হইতে প্রমাণিত হইবে যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৬৬'৪ ভাগ ছিল এশিয়া মহাদেশ ও ২০'৭ ছিল ইউরোপ মহাদেশে ; সুতরাং দেখা

সারণী ২৯

মহাদেশ অনুসারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা। লক্ষ সংখ্যা হিসাবে

মহাদেশ	১৬৫০	১৭৫০	১৮০০	১৮৫০	১৯০০	১৯৩৩	১৯৪০	১৯৪৭	১৯৫০
ইউরোপ	১০০০	১৪০০	১৮৭০	২৬৬০	৪০১০	৫১৯০	৫৭৫০	৫৭৯০	৫৮৯০
উত্তর আমেরিকা	১০	১৩	৫৭	২৬০	৮১০	১৩৭০	১৪৩০	১৫৭০	১৬৫০
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা	১২০	১১১	১৮৯	৩৩০	৬৩০	১২৫০	১৩২০	১৫৩০	১৬৩০
ওশিয়ানিয়া	২০	২০	২০	২০	৬০	১০০	১১০	১২০	১৩০
আফ্রিকা	১০০০	৯৫০	৯০০	৯৫০	১২০০	১৪৫০	১৫৮০	১৯১০	১৯৮০
এশিয়া	৩৩০০	৪৭৯০	৬০২০	৭৪৯০	৯৩৭০	১১২১০	১১৫৫০	১২৩৮০	১২৭২০
মোট	৫৪৫০	৭২৮৪	৯০৫৬	১১৭১০	১৬০৮০	২০৫৭০	২১৭৪০	২৩৩০০	২৪০০০

সারণী ৩০

বিভিন্ন মহাদেশে পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা হার

মহাদেশ	১৬৫০	১৭৫০	১৮০০	১৮৫০	১৯০০	১৯৩৩	১৯৪০	১৯৪৭	১৯৫০
ইউরোপ	১৮.৩	১৯.২	২০.৭	২২.৭	২৪.৯	২৫.২	২৬.৪	২৪.৮	২৪.৫
উত্তর আমেরিকা	০.২	০.১	০.৭	২.৩	৫.১	৬.৭	৬.৬	৬.৭	৬.৯
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা	২.২	১.৫	২.১	২.৮	৩.৯	৬.১	৬.১	৬.৬	৬.৪
ওশিয়ানিয়া	০.৪	০.৩	০.২	০.২	০.৪	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫
আফ্রিকা	১৮.৩	১৩.১	৯.৪	৪.১	৭.৪	৭.০	৭.৩	৮.২	৮.৩
এশিয়া	৬০.৩	৬৫.৮	৬৬.৪	৬৩.৯	৫৮.৩	৫৪.৫	৫৩.১	৫৩.২	৫৩.০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

যাইতেছে যে ইউরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট এশিয়া মহাদেশে ইউরোপ অপেক্ষা বেশি। ইউরোপের সর্বত্রই মানবের স্বাধীন চিন্তাধারা ও শিক্ষাবিস্তার অধিকতর ভাবে চলিতেছে। ফলে সেখানে সাধারণ লোকের জীবিকানির্বাহ ও অন্যান্য দৈনন্দিন কার্য-সমস্যার সমাধান সহজ হইতেছে।

মহাদেশ অনুসারে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর লোকসংখ্যা সারণী ২৯এ দেওয়া হইয়াছে। তবে উপরি-উক্ত হিসাবে দৃষ্ট হয় যে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপের যে লোকসংখ্যা পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ২০.৭ ভাগ ছিল তাহা বর্ধিত হইয়া ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ২৪.৫ হইয়াছে। অথচ এই সময়ে এশিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যার হার শতকরা ৬৬.৪ ভাগ হইতে হ্রাস পাইয়া ৫৩ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত যে বর্তমানে এশিয়া মহাদেশের সর্বত্রই নবজাগরণ দেখা দিয়াছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি, খাদ্যের উন্নতি ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রভূত চেষ্টা হইতেছে।

ভবিষ্যতে এশিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার না কমাইলে সাধারণ লোকের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমেরিকা হইতে নীত হইয়া ইউরোপে গোল আলুর চাষ আরম্ভ হয়। বর্তমানে ইউরোপের দেশসমূহে জমিতে রাসায়নিক সার ও জৈব সার সংমিশ্রিত করিয়া প্রয়োগের ফলে একর-প্রতি ২০০ হইতে ৩০০ মণ আলু উৎপন্ন হইতেছে। এই কারণে ইউরোপে আলু প্রচুর পাওয়া যায়, দাম সস্তা ও উহা খাদ্যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। একজন ব্যক্তি গড়ে বৎসরে জার্মানি ও ফ্রান্সে ৪০০ পাউণ্ড, ডেনমার্কে ৩০০ পাউণ্ড ও ইংলণ্ডে ২০০ পাউণ্ড আলু আহার করে। আলুতে যে কেবলমাত্র শক্তিদানকারী কার্বোহাইড্রেট থাকে তাহা নহে, উহাতে দাঁত, অস্থি ও পেশী গঠনকারী পটাশ, সোডা, চুন, ম্যাগেনেসিয়া ফসফেট প্রভৃতি ধাতব পদার্থও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ইউরোপে আলুর ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার পূর্বে ইউরোপবাসিগণের আহার্যে রুটি মাংস মাছ ডিম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। এই-সকল পদার্থে অম্ল উৎপন্ন হয়। এই অম্ল শরীরের পক্ষে

হানিকর। বর্তমানে তাহারা প্রচুর পরিমাণে আলু ও দুধ অল্প পরিমাণে অন্যান্য খাদ্যের সহিত আহার করিতেছে। ফলে তাহাদের খাদ্য সুষম ও স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। এইরূপ খাদ্য গ্রহণের ফলে লোকের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, যদিও তাঁহারা পর্যাপ্ত পরিমাণ মাংস পাইতেছেন না বলিয়া অভিযোগ করিয়া থাকেন।

ইউরোপ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে প্রচুর পরিমাণ আলু উৎপন্ন ও অধিক পরিমাণে উহা আহার্যে ব্যবহার করিয়া আমরা সাধারণ স্বাস্থ্য আরো উন্নত করিতে পারি। আমাদের শৈল-নিবাসগুলির (Hill Stations) মাটিতে সমতলভূমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাকৃতিক সার রহিয়াছে। পাহাড়ী জমিতে অল্পপরিমাণ রাসায়নিক সারের সহিত পর্যাপ্ত পরিমাণ পাতা খড় প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া আরো অধিক পরিমাণে গোল আলু ও মিষ্টি আলু উৎপন্ন করা সম্ভবপর।

ভারতবাসিগণকে খাদ্যাভাব ও স্বাস্থ্যহানি হইতে রক্ষা করিতে হইলে গোল আলু, রাঙা আলু ও অন্যান্য শাকসবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে এবং তাহাদের আহার্যে আলুর অংশ সর্বাপেক্ষা বেশি রাখিতে হইবে।

ভারতবর্ষে গবাদি গৃহপালিত পশুর উন্নয়নের জন্য কোনো বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না। গবাদি পশুর পুষ্টি ও তাহাদের খাদ্য-তৃণাদির বর্ধনকল্পে বহুল গবেষণা করা আবশ্যক। এই গবেষণা লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য দুগ্ধ সরবরাহে বিশেষ সহায়ক হইবে। গৃহপালিত পশুপালন বিষয়ে ব্যাপক ও গভীর গবেষণার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা নামক স্থান বেশ উপযুক্ত। উক্ত কেন্দ্রের কর্মিগণ গবাদি পশুগণের খাদ্যশস্য তৃণাদি উৎপাদন এবং তাহাদের শরীর ও ব্যাধি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়া থাকেন। তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নহে বলা যাইতে পারে। এই-সকল গবেষণার সম্প্রসারণ আবশ্যক।

গোচারণ

গোচারণ-ভূমির উন্নতি ও নিয়ন্ত্রিত গোচারণই বর্তমানে ভূমির উর্বরতাবৃদ্ধির

প্রধান সোপান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের অনগ্রসর এলাকা সমূহেও গোচারণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। উক্ত এলাকা সমূহে গোচারণ দ্বারা কৃষি-জমির ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা আইনে রহিয়াছে, যেমন—

১. Rural Constables Law— গবাদি পশু চরাইয়া কৃষি-জমির ক্ষতি-সাধন করিলে এই আইন মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

২. Malicious Injuries Law—যদি কৃষি-জমির ক্ষতিসাধনকারী প্রকৃত মালিকের সন্ধান না পাওয়া যায় তবে এই আইনবলে জমির নিকটবর্তী পশু-পালনকারী অধিবাসিগণের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লওয়া যায়।

৩. Shepherd Act— এই আইনে গোরক্ষক ও মেষপালকগণকে লাইসেন্স দেওয়া ও তাহাদের পালে জন্তুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

৪. Goat Law— এই আইনবলে গ্রামবাসিগণ তাহাদের এলাকা হইতে রজ্জুবদ্ধ বা রক্ষিত পশু ছাড়া অন্য পশুকে তাহাদের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গ্রাম হইতে বহিষ্কার করিতে পারে।

৫. Tree Planting of Village Area Law— এই আইনের উদ্দেশ্য গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে বৃক্ষরোপণে উৎসাহ দান ও বনভূমি হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ আহরণ বন্ধ করা। গ্রামবাসিগণ তাহাদের এলাকার জমির শতকরা ২০ ভাগে বৃক্ষরোপণ করিতে পারে। যে এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয় তাহাতে গবাদি পশুর প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে।

আমাদের দেশেও ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও গবাদি পশুর উন্নতিকল্পে উপরি-উক্ত আইনগুলি গ্রহণযোগ্য।

বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়াতে খাদ্যশস্য-উৎপাদন অপেক্ষা গৃহপালিত পশু-পালনের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। কেবলমাত্র খাদ্যের চাহিদা মিটাইবার জন্যই এইরূপ হয় নাই, ট্র্যাক্টর ব্যবহারে ও উপর্যুপরি শস্য-উৎপাদনের ফলে জমির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন্যও উহা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়াতে পালা করিয়া জমিতে তৃণ ও গবাদি পশুর খাদ্যশস্য জন্মাইয়া খুব সুফল পাওয়া গিয়াছে।

কৃষিবিদ্যা-শিক্ষা

ভারত সরকার পশ্চিমবাংলা সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটায় এশিয়ার প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারিত। শ্রীবিড়লা হরিণঘাটায় একটি প্রথমশ্রেণীর কৃষি কলেজ স্থাপনের জন্য পশ্চিমবাংলা সরকারের হস্তে বিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই কৃষি কলেজটি আদিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। তৎপর ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছিল। কিছুদিন হইল কৃষি ও পশুপালন বিভাগকে আলাদা করিয়া বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার একটি শাখা কুচবিহারে স্থাপিত হইয়াছে।

পশুপালন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার জন্য কয়েকটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হইয়াছে ও আশা করা যায় যে ইহা ফলপ্রসূ হইবে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের অভিজ্ঞ পদস্থ কর্মচারিগণের যেমন গবেষণা-কার্য করা উচিত তেমনি কলেজের ডিগ্রি ক্লাসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপনাও করা উচিত। তাহা হইলে ছাত্রগণ প্রকৃত অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইবে।

কৃষিশিক্ষার পরিচালনার ভার লইয়া বাংলা সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গত ৩০ বৎসর যাবৎ যে বিতণ্ডা ও মতদ্বৈধ চলিতেছিল তাহা উল্লেখ্য। যদিও এই বিতণ্ডা আর বর্তমানে বিশেষ নাই। বাংলা সরকারের মতে কৃষিশিক্ষা একটি পেশাদারী বিদ্যা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কেন্দ্রীভূত থাকা উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করেন।

ইউরোপের অনেক দেশে গত ৫০ বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহেই কৃষিশিক্ষা দেওয়া হইতেছে— যেমন কেম্ব্রিজ, গ্লাসগো, রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে ইংলণ্ড ও ওয়েলস্-এ আটটি, স্কটল্যাণ্ডে তিনটি, ও নর্থ আয়ারল্যাণ্ডে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিতেছে। গত কয়েক বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকায় কৃষিবিদ্যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শিক্ষা প্রদানের জন্য স্থাপিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম দেশে দক্ষ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপনান্তে শিক্ষার্থিগণকে 'ডক্টর' উপাধি প্রদান করা হয়। এই-সকল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই রাষ্ট্র-পরিচালিত। আমেরিকায় এই প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি এবং সেখানে এই-সকল প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র ও জনসাধারণের দানে পরিচালিত হয়। বাহির হইতে পরীক্ষক নিযুক্ত না করিয়া এই-সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের তাঁহাদের ছাত্রগণকে স্নাতক উপাধি দানের অধিকার আছে। এই-সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের পরিচালনাধীন পৃথক গবেষণাগার, পশুপালন-কেন্দ্র, পশুশালা প্রভৃতি রহিয়াছে। সুইডেনের সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীন ২৪টি গবেষণাগার ও পশুপালন-কেন্দ্র, পশুশালা প্রভৃতি রহিয়াছে। ভারতবর্ষেও বর্তমানে বেশ কয়েকটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবাংলার সমস্যা

এই বিষয়ে পশ্চিমবাংলার অনেকগুলি প্রধান সমস্যা বর্তমান। নিম্নে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা গেল—

১. ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষকগণ পর্যাপ্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার ক্রয় করিতে অসমর্থ ; রাসায়নিক সারের মূল্য ক্রমবর্ধমান। সেজন্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকে অল্পব্যয়ে ভূমির উর্বরতাবৃদ্ধি করিবার উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে হইবে। এ দেশে প্রাপ্ত গবেষণার ফলের বহুল প্রচার আবশ্যক।

২. শহরের আবর্জনা ও তরল সারকে উত্তমরূপে কলিকাতা এবং অন্যান্য নগরের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে ও এলাকায় শস্য-উৎপাদনের উন্নতিকল্পে ব্যবহার করিবার বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। চীন ও জাপানে এরূপ করা হইয়া থাকে।

আবর্জনা হইতে জ্বালানী গ্যাস (Combustible gas) উৎপাদন করিলে এই সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, গ্যাস-উৎপাদনে মূল্যবান প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড ও অন্যান্য নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফেট জাতীয় পদার্থ অব্যবহার্য থাকিয়া যায়। বর্তমানে শক্তি-সমস্যা যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ গ্যাস উৎপাদন করিতে হইলে এই-সব স্থানের তলানী জমিতে প্রয়োগ করা আবশ্যিক করিতে হইবে।

সাধারণ জমিতে ধাতুমল ও ফস্‌ফেট পাথর আবর্জনার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৩. আমি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানের লবণাক্ত ও ঊষর জমিকে ক্যালসিয়াম জমিতে পরিবর্তিত করিলে পশ্চিম-বাংলার শস্য-উৎপাদনের নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে। ঊষর ও লবণাক্ত জমির সংস্কার-সাধনের উপায় পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

—